

## কেউ জানে কেউ জানেনা



দশদিক মিডিয়া পাবলিকেশন্স

কেউ জানে কেউ জানেনা (১ম খণ্ড)

শরাফুল ইসলাম

দশদিক

দশদিক মিডিয়া পাবলিকেশন্স

কেউ জানে কেউ জানেনা ০২

কেউ জানে কেউ জানেনা  
শরাফুল ইসলাম

প্রকাশকাল:  
অমর একুশে বইমেলা  
ফেব্রুয়ারি- ২০১৩

প্রকাশক:  
সামাউল হক  
দশদিক মিডিয়া পাবলিকেশন  
ই-মেইল: info@doshdik.com

ঋষ্টস্থ়ত্ব:  
তানিয়া ইসলাম মিথন

মুদ্রণ:  
এন-ট্যায়ার প্রিটিং প্রেস  
৪৮ ফকিরাপুর, ঢাকা।

অঙ্গসজ্জা ও সম্পাদনা:  
কামরূল হাসান মিলন

প্রচ্ছদ:  
মেহেদী হাসান মিফতা

মূল্য:  
বাংলাদেশ: ১৫০ টাকা  
জাপান: ২০০০ ইয়েন

*Printed in Bangladesh, 2013  
ISBN- 978-984-3330-71-1*

উৎসর্গ

মিথুন

এবং

শব্দকে

কেউ জানে কেউ জানেনা ০৮

### **লেখকের প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ**

- মুখ ও মুখোশের ছেঁড়া পাতা (বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী)
- মুজিব হত্যার সেই রাতে (রেনিয়াস পাবলিকেশন্স, ঢাকা)

### ঘাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ

সানাউল্লাহ নূরী (সাংবাদিক), হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ (সাংবাদিক), মাহবুবুর রহমান রশো (সাংবাদিক), খন্দকার হাসনাত করিম (সাংবাদিক), সৈয়দ সিরাজুল কবির (সাংবাদিক), আব্দুর রহমান (সভাপতি বাচসাস), আলিমুজ্জামান হারুণ (সাংবাদিক), এ জে এম শহীদুজ্জাহ (ফটো থাফার), আশরাফ খান (সাংবাদিক), রূপা লায়লা (সঙ্গীত শিল্পী), সাবিনা ইয়াসমিন (সঙ্গীত শিল্পী), জানে আলম (সঙ্গীত শিল্পী), আবদুল হাই শিকদার (কবি, সাংবাদিক), আ ব ম ছালাহউদ্দিন (গণসংযোগ কর্মকর্তা, শিল্পকলা একাডেমী), ড. শেখ আলীমুজ্জামান ও সানাউল হক (সম্পাদক, দশদিক মিডিয়া)।

## ভূমিকা

প্রবাসী হওয়ার কারণে লেখালেখির আগ্রহটা মরে গিয়েছিল। আমার স্ত্রী নিয়মিতভাবে চেষ্টা করেছে ইচ্ছেটাকে আবার জাহাত করার। কিন্তু অস্তরালের ফ্রেন্ড, ক্রোধ, আক্রোশ, আর ঘৃণার পুঁজিভূত অনুভূতি কখনোই লেখালেখির অনুকূলে সড়া দেয়নি।

বিগত দেড় দশকে যত লেখক, সাংবাদিক, শিল্পী অতিথি হয়ে এসেছেন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, তাদের প্রায় সকলেই আমার বন্ধু, অগ্রজ প্রাচীম কিংবা অনুজ্ঞের মতো। শিশু সাহিত্যিক লুৎফুল রহমান রিটন দৃতাবাসে চাকুরি নিয়ে আসার পর আমি সর্বপ্রথম কেন বন্ধুর সঙ্গে বেছায় দেখা করি। সুনীর্ধকালের এই বন্ধুকে পেয়ে আমার স্ত্রী আবার আমাকে লেখালেখির জগতে ফিরে যাবার দাবি তোলে। রিটনও এতে সর্বাত্মক সমর্থন দিয়ে পুনরায় কলম হাতে নেয়ার অনুরোধ রেখে যায়।

এরপর টোকিও থেকে প্রকাশিত ‘পরবাস’ পত্রিকার সম্পাদক কাজী ইনসান আমার ব্যবসাকেন্দ্রে হানা দেন। জোর করে লিখিয়ে নেন ‘যায়াবর’ শিরোনামের কয়েক কিন্তি।

অবশ্যে ঢাকা থেকে এলেন, দীর্ঘদিনের সুহাদ, অগ্রজ প্রাচীম কথাসাহিত্যিক বন্ধু ইমদাদুল হক মিলন। আমার ঘরে আত্মিহেয়তা প্রাণকালে সাহিত্য এবং সঙ্গীত নিয়ে আড়তা হয় সারারাত। এ সময়ও আমার স্ত্রীর একই দাবি, আমাকে লিখতে হবে। মিলনও তখন অবশ্যই লিখতে হবে বলে দৃঢ়কর্ষে আদেশ দেন। এশিয়ার শ্রেষ্ঠ ভাস্কর হিসেবে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত শিল্পী বুলবুল একাডেমীর বন্ধু রাসা এসেছিল একটি প্রদর্শনী করতে। কিন্তু বাঙালী আয়োজকের প্রতিরাগার শিকার হলে কমিউনিটিতে ব্যাপক আলোড়ন তোলে। অবশ্যে আমার ব্যবসা কেন্দ্রে প্রদর্শনীর মাধ্যমে সবক’টি শিল্প কর্ম বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়। তখন আমার ঘরে বাংলাদেশী খাবার থেতে থেতে রাসা বললো, অভিযান কার সাথে করো? তুমি ইচ্ছে করলেই লিখতে পারো, যা অনেকেই পারে না। বন্ধু কবি সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল তো দেশে ফিরে গিয়ে একটি দৈনিকে দুচার লাইন লিখেই ফেললো আমাকে নিয়ে। আর প্রবাসী বন্ধু প্রবীর বিকাশ সরকার শতবার বলেছে ‘দোস্ত লেখালেখি বন্ধু রাখিস না, আবার শুরু কর। এগুলোই থাকবে।’

আর শেষ ধার্কাটি দিয়ে গেলেন যানু শিল্পী জুয়েল আইচ। বলে গেলেন, লিখতে জেনে না লিখলে জাতির সঙ্গে প্রতিরাগ করা হয়। এদিকে টোকিও বৈশাখী ফেস্টিভ্যাল এ্যাওয়ার্ড দিয়ে আমাকে বাধিত করা হয় কলম হাতে নেয়ার জন্য। তাই দশদিক সম্পাদক সানাউল হকের অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারিন। ইমদাদুল হক মিলনের পরামর্শ মতে জীবনের বিকিঞ্চণ স্টলাঙ্গলো নিয়ে শুরু করি ধারাবাহিক রচনা ‘কেউ জানে কেউ জানেনা’ লিখতে গিয়ে আগ্রহটা আরও উজ্জিবিত হয়। দেশ বিদেশ থেকে পাঁঠক এবং পুরনো বন্ধুদের সাড় পাই। যাদের নিয়ে লেখা, যারা জীবিত আছেন, সেই সব স্নামখ্যাত বাঙালীর কাছ থেকে শুভেচ্ছা আসে। তাই মনে হয়েছে, বিফলে যায়নি এই প্রয়াস। এই লেখার সঙ্গে আমিও সোনালী অতীতের পথ-ঘাট, সড়ক প্রাচীয়বার প্রাদক্ষিণ করি। সব লেখার পর্যাণ ছবি বা প্রত্বাবলী পত্রস্থ করতে পারিন। আমার সহকর্মী ফটোগ্রাফার কখনো দু’একটি ছবি উপহার হিসেবে দিয়েছেন। সেগুলোও সহতনে সংরক্ষণ করার তাগিদ অনুভব করিন। কিন্তু এই লেখা লিখতে গিয়ে মনে হলো, ছবিগুলো সংরক্ষণ করা জরুরি ছিল।

লেখা পড়ে কেউ বিব্রত হতে পারেন, দ্বিমত পোষণ করতে পারেন। কোথাও কোন তথ্যক্রটিও মনে হতে পারে। তবে পেশাগত জীবনের সততার উপর দাঁড়িয়েই লিখেছি প্রতিটি ঘটনা। ভবিষ্যতে কোন গবেষণার তথ্যসূত্র হিসেবেও যদি এই গ্রন্থটি সহায়ক হয় তবেই স্বার্থক হবে আমার প্রয়াস।

দশদিক মিডিয়ার কর্পোরেল সানাউল হকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই তারই কাগজে প্রকাশিত লেখাগুলো নিয়ে গ্রন্থ করা জন্য। ধন্যবাদ আমার স্ত্রী মিথুনকে যার নিয়মিত তাগিদে এই লেখা।

তারিখ:- ১৩ আগস্ট, ২০১২

-শরাফতুল ইসলাম

## প্রকাশকের কথা

মননশীল প্রবন্ধকে স্নেতস্বত্তি করে অবিস্মিত ধারাকৃপ যারা দিতে পারেন তাদের সংখ্যা খুবই কম। অনুসন্ধিৎসু পর্যবেক্ষণী শক্তির অধিকারী লেখক শরাফুল ইসলাম তেমনি ধারার। বাংলাদেশের ষাট ও সত্তর দশক থেকে শুরু করে এ প্রজন্মের তারকা শিল্পীদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে তিনি দেখেছেন শিল্পীদের জীবনের নানা দিক। তাই কিছুটা নিজের আপন ভুবনে এঁকেছেন বিভিন্ন অজানা কথা। তুলে এনেছেন আত্মকথা।

আত্মকথা একজন মানুষের নিজস্ব জীবনের চলচিত্র। যা তিনি নির্মাণ করেন দর্শক বা শ্রেতা হিসেবে সাধারণ মানুষ দেখে বা শুনে। বিখ্যাত মানুষদের আত্মকথা পাঠককুলে বরাবরই কৌতৃহলোদীপক। সেই দর্পণে কারো ব্যক্তিগত বিষয়ের প্রতিচ্ছবিকে মিলিয়ে দেখার সাধ থাকে। সেই সাথে থাকে অপরিসীম ও শিক্ষামূলক। সবসাটী লেখক শরাফুল ইসলাম এর “কেউ জানে কেউ জানেনা” তেমনি একটি উপহার আমাদের জন্য।

কেউ জানে কেউ জানেনা- দশদিক ম্যাগাজিনে যারা নিয়মিত পড়েছেন তারা নিশ্চয়ই জানেন, এর বিষয়বস্ত। বাংলাদেশের চলচিত্র রাজনীতি এবং সংস্কৃতি জগতের অনেক না বলা কথাই মূলত এর প্রধান উপজীব্য। টোকিওতে বাংলাদেশ লেখক, গবেষক শরাফুল ইসলাম বাংলাদেশ এবং জাপানসহ উপমহাদেশের তারকাদের সাথে তাঁর সম্পর্কের বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরেছেন এ হাত্তে।

চলচিত্র নিয়ে শরাফুল ইসলাম কাজ করেছেন দীর্ঘদিন। এ দীর্ঘ সময়ে অনেকের সাথেই সম্পর্ক হয়েছে তার। এর আগেও চলচিত্রের শেকড় নিয়ে বই লিখেছেন ‘মুখ ও মুখোশের ছেঁড়া’ পাতা। সমাদৃতও হয়েছে সেটি। মূলত শেকড় সন্ধানী লেখক তিনি।

কেউ জানে কেউ জানেনা বইটি শেকড়ের অনেক গভীরে নিয়ে যাবে বলেই আমি মনে করি। দশদিক মিডিয়া সবসময়ই চায় ভাল কিছু উপহার দিতে। এরই ধারাবাহিকতায় বই প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। আশা করি পাঠককুল প্রাণ খুঁজে পাবেন গ্রন্থটিতে।

সানাউল হক  
প্রকাশক  
দশদিক মিডিয়া পাবলিকেশন্স



কবি কাজী নজরুল ইসলাম

১.

কিছু মানুষ তাদের মনস্তাতিক বিপ্লবের প্রতিফলন ঘটাতে গিয়ে ক্ষণজন্মা হয়ে ওঠেন। আর ইতিহাস তাঁদের মহিমা গাঁথা বহন করে গৌরাবার্থিত হয়। সেই ইতিহাস আলোকোজ্জ্বল ইতিহাস। যার কোনো মলিনতা নেই। এমনই একজন আলোকোজ্জ্বল অমলিন ইতিহাসখ্যাত পুরুষ সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন। সর্বক্ষেত্রে মুসলমানদের পশ্চাংপদতা দেখে যিনি দারুণভাবে আলোড়িত হয়েছিলেন ১৯১৮ সালে।

ইনসিওরেন কোম্পানির একজন সাধারণ কর্মচারী মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন অনুভব করেছিলেন, পশ্চাংগামী মুসলমাদের আলোকোজ্জ্বল জগতের সন্ধান দিতে না পারলে কর্তৃন তমশা থেকে জেগে উঠার কোনো আশা নেই। তাই তিনি একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নেন। সুকঠিন এই ব্রত পালনে। চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ১৯১৮ সালে প্রকাশ করেন মাসিক সওগাত।

চারদিকে সাড়া পড়ে যায় পত্রিকাটি প্রকাশের পর। তিনি ঘোষণা দেন মুসলিম জাগরণে এই সওগাত প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ভূমিকা পালন করবে। তাই মুসলিম লেখকদের যে কোনো লেখা সানন্দে ধ্রুণ করা হবে। অঙ্ককারের মাঝে আলোকবর্তিকা দেখে সোচ্চার উচ্চারণে এগিয়ে আসেন সকল মুসলিম লেখক। ইব্রাহিম খাঁ, এস ওয়াজেদ আলী থেকে শুরু করে কবি শামসুর রহমান পর্যন্ত সওগাতের লেখক তালিকায় স্থান করে নেন। সওগাতের দীর্ঘ ইতিহাসের একটি সোনালী অধ্যায় রচনা করেছেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম। কবিতার সমাধী লিখে

সওগাতে অভিষেক ঘটে নজরলের। সেই থেকে সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসির উদিন নজরলের অভিভাবক হিসেবে আবির্ভূত হন।

এই মহীরুহ প্রতিষ্ঠান সাদৃশ্য মানুষটির সঙ্গে পরম কৌতুহলে আমি বার বার মুখোমুখি হই। আমার বাবা (দুদু মির্যা) ছিলেন ৫২'র ভাষা আন্দোলনে তৎকালীন মুসিগঞ্জ মহকুমার আহ্বায়ক। তাঁর মুখ থেকে বহুবার বহু ঘটনা প্রসঙ্গে মোহাম্মদ নাসির উদিনের কথা শুনে আমার আগ্রহ দ্বিগুণ বেড়ে যায়। তাছাড়া এমন একজন ইতিহাস সৃষ্টিকারী মানুষের সঙ্গে পরিচিত হতে কার না আগ্রহ হয়।

আমি যখনই তাঁর অফিসে যেতাম, ততবারই তাঁর কোনো স্মৃতি, ঘটনা বা মন্তব্য টেপ রেকর্ডে রেকর্ড করে রাখতাম।

কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে মোহাম্মদ নাসির উদিনের একটি স্মৃতি কথা আজ এখানে তুলে ধরবো। জানিনা এই ঘটনা কোথাও লিপিবন্ধ হয়েছে কিনা। একটি খণ্ড ঘটনা হিসেবে এর গুরুত্ব এবং তাৎপর্য সুগন্ধীর।

মোহাম্মদ নাসির উদিন বলেন, ফজলুল হক সাহেব (শেরে বাংলা একে ফজলুল হক) দ্বিতীয় দফা তাঁর নবযুগ পত্রিকা বের করার সিদ্ধান্ত নেন।

কিন্তু সম্পাদক কাকে করবেন, তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। পরে একদিন আমাকে ডেকে পাঠালেন আমি তাঁর বাসায় দেখা করতে গেলে তিনি বললেন, ‘নজরুলকে (কবি কাজী নজরুল) নবযুগের সম্পাদক করতে চাই তুম কি বলো?’ আমি বললাম, ‘অতি উত্তম সিদ্ধান্ত। নজরুলকে সম্পাদক করা হলে কাগজটি জনপ্রিয়তা পাবে।’ ফজলুল হক সাহেব তখন আমাকে দায়িত্ব দিলেন নজরুলকে তাঁর বাসায় নিয়ে যেতে।

আমি পরদিন সকালে নজরুলের সঙ্গে দেখা করতে যাই তাঁর বাসায়। দু'তিন বার ডাকার পর তিনি বেরিয়ে এলেন। বললেন, কি ব্যাপার? আমি তো এই আচরণে হতবাক! যে নজরুল আমাকে দেখা মাত্রই হৈচে করে উঠেন, তিনি কিনা গন্তীর কঢ়ে প্রশ্ন করেন, কি ব্যাপার! তবুও আমি নিজেকে সামনে নিয়ে বললাম, ‘ফজলুল হক সাহেবের পুনরায় নবযুগ বের করবেন। আপনি হবেন এর সম্পাদক। আমার সাথে এখন ফজলুল হক সাহেবের বাসায় যেতে হবে।’ নজরুল তখন আরও গন্তীর কঢ়ে বললেন, ‘আমার কাছে গভীর রাতে বাণী আসে। আপনাদের জন্য কোনো বাণী এলে জানাবো।’ এই উক্তি করে নজরুল ঘরে চুকে গেলেন। আমি বিমর্শিতে ফিরে এসে এই ঘটনা হক সাহেবকে জানালাম। এরপরও তিনি আমাকে আরও একবার চেষ্টা করতে বললেন আমি এর পর কয়েক দফা তাঁর বাসায় গিয়ে শেষ পর্যন্ত সফল হই। নজরুল নবযুগের সম্পাদক হলেন। কিন্তু তাঁর আচার-আচরণ, পান খাওয়ার উৎসাহ, অর্থাৎ উজ্জীবিত এমন একজন মানুষ সম্পূর্ণ বদলে গেছেন। যেদিন নবযুগ নতুন করে প্রথম বের হবে, তার আগের দিন নজরুলকে বলা হলো সম্পাদকীয় লেখার জন্য। নজরুল দরজা বন্ধ করে সম্পাদকীয় লিখছেন। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গেলো কিন্তু তিনি বেরচ্ছেন না।

কারো ডাকেও সাড়া দিচ্ছেন না অনেকক্ষণ পরে দরজা খুলে বললেন, ‘এই নিন



মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন



সওগাত পত্রিকার প্রচ্ছদ

সম্পাদকীয়।’ হাতে নিয়ে দেখি একটি কবিতা লিখেছেন সম্পাদকীয় হিসেবে। তারপর থেকেই নজরগলের মধ্যে অসংলগ্নতা লক্ষ্য করা যায়। অবশেষে তো আর তিনি লিখেছেন না, থাকলেন না সুস্থ স্বাভাবিক একজন মানুষ। ধীরে ধীরে স্মৃতিশক্তি হারাতে লাগলেন। আচরণে অস্বাভাবিকতা। বলা যায়, উন্নাদ। তারপর তো নিয়ে যাওয়া হলো বিদেশে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় নজরগলকে জাহাজে করে বিদেশে নিয়ে যান চিকিৎসার জন্য।



সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসির উদিনের সঙ্গে শরাফুল ইসলাম

২.

সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসির উদিন তাঁর সুনীর্ধ সাংবাদিক জীবনে বাংলাদেশের সাহিত্যের ভাণ্ডারে জমা রেখে গেছেন মুসলিম রেনেসাঁর অঙ্গ সম্পদ। বাংলা সাহিত্যের বিগত খ্যাতিমান পুরষরা সবাই উঠে এসছেন মোহাম্মদ নাসির উদিনের হাত ধরে। কোলকাতা কেন্দ্রিক লেখক বৃন্দজীবিদের মিলন ক্ষেত্রে তৎকালীন মুসলিম লেখকদের কোন প্লাটফর্ম ছিলনা। সওগাত প্রকাশের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় বরণীয় যত লেখক সাহিত্যিক রয়েছেন তাঁদের সবাই মেধা বিপণনের সুবর্ণ সুযোগ লাভ করেন। বর্তমানেও কোলকাতা মুসলমান লেখকদের মেধার সীকৃতি লাভে প্রতিকূলতাই বেশী। এ ক্ষেত্রে বর্তমান সুলেখক আবুল বাশারের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। লেখালেখির দীর্ঘ ২৬ বছর পর তাঁর প্রথম উপন্যাস কোলকাতার প্রেষ্ঠ কাগজ ‘দেশ’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এক সাক্ষৎকারের তিনি তাঁর ভারাক্রান্ত মন নিয়ে এই তথ্য জানান।

এ ক্ষেত্রে একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন যে, মুসলিম রেনেসাঁ মানে ইসলামী রেনেসাঁ নয়। সাহিত্য ক্ষেত্রে মুসলিম লেখকদের উজ্জীবিত করে মেধা ও মননের বিকাশ মাত্র। এক ধরনের গোঁড়ামী থেকে মুসলমান লেখকদের অগ্রসর পথের সন্ধান দেওয়া। তাই সওগাত। প্রকাশনার কারণেই আজ কবি কাজী নজরুলের মতো লেখককে আবিক্ষার করা সম্ভব হয়েছে। ফররুখ আহমেদ, আবদুল কাদির, সৈয়দ এমদাদ আলী, আহসান হাবীব, ইব্রাহীম খাঁ, গোলাম মোস্তফা, এস ওয়াজেদ আলী, লুৎফুর রহমানসহ প্রায় সকল কবি সাহিত্যিকই সওগাতের মাধ্যমে অভিষেক করেন।

‘বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ’ নামে মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন একটি বই লেখার পরিকল্পনা করেন। বইটি কমপক্ষে ২০ খণ্ডে প্রকাশ করা যেত। কিন্তু তিনি এক সঙ্গে অর্থাৎ অখণ্ডভাবে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেন। সন্তুষ্ট ত ৫ হাজার পৃষ্ঠার বইটি। সঠিক পৃষ্ঠা সংখ্যা এই মুহূর্তে মনে করতে পারছিনা। এই বইটি সওগাতের সকল লেখকদের নিয়ে সংকলিত।

মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন সাধারণত কোন কাজেই কারো সহযোগিতা বা সাহায্য থাহ্য করতেন না। কিন্তু ‘বাংলা সাহিত্যে সওগাত যুগ’ প্রকাশের সময় আমি নিয়মিত ভাবে তাঁর অফিসে গিয়ে প্রফুল্ল দেখার কাজে সাহায্য করার সুযোগ পেয়েছিলাম। এখানে উল্লেখ্য যে, তিনি একটি মোটা প্লাস দিয়ে একটি একটি করে বানান শুন্দি করতেন। এমন একজন সোনালী পুরুষের সান্নিধ্য লাভের প্রত্যাশায় আমি তাঁর এই বইয়ের প্রফুল্ল দেখার কাজে সংশ্লিষ্ট হই।

একদিন প্রফুল্ল দেখার সময় মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন বলেন, শুরুতে বুঝিনি যে নজরগুল একদিন এত বড় করি হবে। আমি তাঁর প্রথম দিককার অনেক লেখাই ছাপিনি। ফেলে দিয়েছি। আমার এই আফসোস কোন দিন যাবে না। নজরগুলের হাতের যে কোন আঁচড়ই যে স্বর্গ সাহিত্য হয়ে যাবে- তা কি জানতাম। তাঁর অনেক লেখা ছাপিনি বলে তিনি অনেক অভিমান করতেন। এমনকি আমার কাগজে আর লেখা পাঠাবেন না বলে চির্ঠিও দিয়েছেন। কিন্তু ‘বাউলের আত্মাহিনী’ ছাপার পর থেকে তাঁর আর অভিমান ছিলনা। আর ‘চল চল চল’ ছাপা হওয়ার পর তো চারিদিকে হৈ চৈ শুরু হয়ে যায়।

উল্লেখ্য করি কাজী নজরগুল ইসলাম অসুস্থ হওয়ার পর তাঁর চিকিৎসার দায়িত্ব নেন ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়। কিন্তু অসুস্থতা বাঢ়তে থাকায় সিদ্ধান্ত হয়, ভিয়েনাতে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানো হবে। সঙ্গে থাকবেন ডাঃ রায় ও তার বোর্ডের সদস্যরা। জাহাজে করে নজরগুলকে ভিয়েনা নেয়ার পথে তাঁর অসুস্থতা খানিকটা উন্মাদনায় রূপ নেয়। তখন ডাঃ বিধান রায় সহকারী ডাঙ্কারকে বলেন, একটি ইনজেকশন পুশ করতে। যার পর থেকে শান্ত হয়ে যান করি নজরগুল। অবশেষে ভিয়েনাতে চিকিৎসার পরও কোন উন্নতি ঘটেনি তাঁর। কথা প্রসঙ্গে মোহাম্মদ নাসির উদ্দিনের কাছ থেকে এই তথ্যটি জানতে পারি। প্রবর্তীতে ১৯৮৬ সালে নজরগুলকে ইনজেকশন দেওয়া সেই সহকারী ডাঙ্কার ঢাকা সফরে এলে তার মুখেমুখি হই। নজরগুলকে ইনজেকশন দেয়া প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি তা স্বীকার করে বলেন এই তথ্যটি কোথায় শুনেছেন? বললাম, সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসির উদ্দিনের কাছে শুনেছি। ডাঙ্কার বললেন, ঠিকই শুনেছেন। সমুদ্র পথে জাহাজে যখন ভিয়েনার দিকে যাচ্ছি তখন করি নজরগুলের অসুস্থতা বেড়ে যায়। তাঁর আচরণে এক ধরনের অশান্ত ভাব প্রকট হতে থাকে। বলা যায়, অনেকটা উন্মাদনা। ডাঃ বিধান রায়সহ আমরা সকলে মিলে মানসিক সাপোর্ট দেওয়ার চেষ্টা কির। কিন্তু দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও করিব অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না। তখন তাঁকে ঘুমানের জন্য একটি ইনজেকশন পুশ করতে বলেন

বিধান বাবু এবং ইনজেকশনে কাজ হয়। কবি ঘূর্মিয়ে পড়েন। পরবর্তীতে তিনি আর অশান্ত হননি। তাকে নিয়ে ভিয়েনা যাই। কিন্তু সেই চিকিৎসাতেও কোন কাজ হলোনা। তবে প্রথম দিকে তিনি পরিবারের সদস্যদের সহ্য করতে পারতেন না। চিকিৎসার পর এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। পরিবারের সবাইকে চিনতে পারতেন। তাদের সেবা গ্রহণ করতেন। তবে তাঁর মধ্যে কাগজ ছেঁড়ার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যেতো। সম্ভবত তিনি লিখতে চাইতেন।

তিনি নিজের লেখা গান শুনলে স্থির হয়ে যেতেন। একটু পরই আবার শুরু করতেন কাগজ ছেঁড়া। কবিকে অনেক কাছ থেকে দেখেছি। সেই স্মৃতি আমার সারা জীবনের অমৃল্য সম্পদ। তবে আফসোস, এমন একজন প্রতিভাধর মানুষ সুস্থ থাকলে বাংলা সাহিত্য শতশত বছর এগিয়ে যেত।

---



কবি কাজী নজরুল ইসলাম

৩.

কবি কাজী নজরুল ইসলামের রহস্যময় অসুস্থতা এখনো রহস্যাবৃত। নজরুল-রবীন্দ্র সম্পর্ক নিয়ে নানা ধরনের বক্তব্য শোনা যায় পক্ষ ভিত্তিক সমিকরণে। কিন্তু গবেষকরা আজ পর্যন্ত নজরুল জীবনের আদ্যোপাত্ত, খুঁটি নাটি বিষয় নিয়ে সঠিক এবং তথ্য ভিত্তিক বিস্তারিত কোন কাজ করেননি। নজরুল জীবনীই এখনো অসমাপ্ত। বহুমুখী মহাপ্রতিভাবান এই কবির সমস্ত কর্মকাণ্ড এবং সৃষ্টি নিয়ে রহস্যের অনেক কথাই মিয়া কালচার বাবু কালচারের যাতাকলে পক্ষপাত তুষ্টি নির্ণয়ের সীমারেখা তৈরী করেছে। যা আমাদের হীনমন্যতা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

কবি নজরুল ১৯৪২ সালে অসুস্থতার দিকে অগ্রসর হন। প্রাপ্ত তথ্যমতে এই বছরের ১৭ জুন তিনি একটি পত্র লিখেন তার পরম বন্ধু জুলফিকার হায়দারকে। সেই পত্রে তিনি রক্তচাপে ভুগছেন বলে উল্লেখ আছে। একই সঙ্গে তিনি অঢ়িরেই কঠিনভাবে রোগাক্রান্ত হওয়ার আভাস নেন। আর তাঁর এই অসুস্থতায় পুরো পরিবার দারণভাবে উদ্বিগ্ন বলে উল্লেখ করেন। অর্থ কঠে দিনাতিপাতের কারণে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ডঃ সুকুমার গুপ্ত নজরুল চরিত মানস এ এই পত্রের বরাত দিয়ে জানান যে, কবি তাঁর সারা শরীরে অসহ্য ব্যথা অনুভব করছেন বলে জুলফিকার হায়দারের কাছে চিঠিতে উল্লেখ আছে। নজরুল আফসোস করে আরও বলেন, হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যয় বহু করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। নজরুল তিরক্ষার পূর্ণ ভাষায় পারস্যের মহাকবি ফেরদৌসির মত জানাজার নামাজের সময় দান করা টাকার প্রত্যাখান করেন। কবি

নজরুল লিখেছেন যে, তিনি তাঁর পরিবারের সদস্যদেরকে সেই রকমভাবে দান করা অর্থ গ্রহণ না করার জন্য বলে যাবেন।

এই পত্র থেকে অনুধাবন করা যায় যে, নজরুল কথানি অর্থ কষ্টে নিমজ্জিত ছিলেন। কতটা ক্ষোভ ছিল তার অস্তরজুড়ে। একজন কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক যোদ্ধা সৈনিক, চলচিত্র পরিচালক, অভিনেতা সঙ্গীতজ্ঞ সাংবাদিক বৈচিত্র্যময় আলোকোজ্জল মহাপ্রতিভাবান মানুষটি হাসপাতালের শয়্যায় অর্থ কষ্টে হাবুড়ুর খেয়েছেন। যা তার মানসিক ভারসাম্যতা কেড়ে নেয়।

নজরুলকে প্রথম চিকিৎসা করা হয় কোলকাতার লুমবিনি পার্ক মানসিক হাসপাতালে। তারপর নিয়ে যাওয়া হয় লন্ডনে। সেখানকার প্রথ্যাত ডাঃ স্যার উইলিয়াম সহ একাধিক চিকিৎসক তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। অতঃপর নিয়ে যাওয়া হয় ভিভেনেতে। ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের পরামর্শে নেয়া হয় সেখানে। সবশেষে বাংলাদেশে নিয়ে আসার পর তিনি ভর্তি হন তৎকালীন পিজি হাসপাতালে। যা বর্তমানে বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল।

মূলতঃ কবি কাজী নজরুল ইসলাম শৈশব থেকেই অর্থ কষ্টে দিনানিপাত করেন। বৃটিশ শাসনের সূচনা লগ্নে অর্থাৎ ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলে পাটনা থেকে পালিয়ে আসনে নজরুলের পূর্ব পুরুষ। সেই আমলের বিচার ব্যবস্থা ‘কাজীর বিচার’ হিসাবে স্বীকৃত ছিল। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পদায়াতে বৃটিশ বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে কাজীর বিচারকে উৎপাটনের পদক্ষেপ নেয়া হয়। উচ্চেদ শুরু হয় সর্বজন স্বীকৃত বিচারক কাজীদেরকে। হত্যা করা শুরু হয় তাঁদের। তাই নজরুলের পূর্ব পুরুষ প্রধান কাজী অর্থাৎ বিচারক হিসেবে অধিষ্ঠিত থাকার কারণে বৃটিশদের রোষানলে পড়েন। তাই হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারে এমন পূর্বাভাস পেয়ে রাতের অন্ধকারে পাটনা থেকে বর্ধমান জেলার চুরগিলিয়া গ্রামে এসে আশ্রয় নেন। সেই কাজীরই সুযোগ্য উত্তরসূরী কাজী নজরুল। কিন্তু সবকিছু ফেলে পালিয়ে আসা কাজী কিছুদিন পরই অর্থ কষ্টের দিকে ঝুঁকতে থাকেন।

বিচারক কাজী পরিবারের সন্তান হিসেবে কাজী নজরুলের কিশোর বয়সের একটি ঘটনা ন্যায় বিচারের রক্ত প্রবহমানতার ইঙ্গিত দেয়। নজরুল যখন পঞ্চম শ্রেণী থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন, তখন একই শ্রেণীর বেশ ক'জন ছাত্রকে ছেস নম্বর দিয়ে উত্তীর্ণ করা হয়। কোন কোন ছাত্রকে ৫ নম্বর পর্যন্ত ছেস দেওয়া হয়। কিন্তু নজরুল সরাসরি প্রধান শিক্ষকের বরাবর এই ছেস নম্বর তাঁকে দেওয়ার আবেদন করেন। উত্তরে প্রধান শিক্ষক বলেন, তুমি তো উত্তীর্ণ হয়েছ এবং সর্বাধিক নম্বর পেয়েছ। তাই তোমার ছেস নম্বরের দরকার নেই। কিন্তু বিচারক কাজীর উত্তরসূরী প্রতিবাদ করে বলেন সবার জন্য বিচার সমান হওয়া উচিত। এবং নজরুল স্কুল ত্যাগ করে চলে আসেন।

সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন একদিন কথা প্রসঙ্গে বলেন, নজরগুল যে ন্যায় বিচারের পক্ষে প্রতিবাদী ছিলেন এতে কোন সদেহ নেই। তিন যখন সৈনিক হিসেবে পল্টনে যোগ দিয়ে করাচী ছিলেন তখন সওগাতের গ্রাহক হন ডাক যোগে। তখন থেকেই অনেক লেখা পাঠাতেন। কিন্তু লেখা অর্থাৎ কবিতাগুলো আমার কাছে অতি উচ্ছ্বাস মনে হয়েছে। একজন তরুণ সৈনিকের এরকম উচ্ছ্বাস পূর্ণ কবিতাগুলো আমি ছাপিনি। এরপর তিনি প্রতিবাদস্বরূপ একটি কবিতা পাঠালেন যার শিরোনাম ছিল ‘কবিতার সমাধী’ সেই সঙ্গে একটি পত্র। সারাপত্রেই তার ন্যায় বিচার অধিকারের কথা স্পষ্ট। এবং তিনি পত্র শেষে উল্লেখ করেন ‘কবিতার সমাধী’ হচ্ছে তার শেষ লেখা। অর্থাৎ কবিতার সমাধীই তিনি রচনা করেছেন। আর লেখা পাঠাবেন না।

মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন বলেন, আমি কবিতার সমাধী কবিতা ছেপে দেই। তারপরই তিনি অতি উৎসাহে ‘বাউডেলের আত্মকাহিনী লিখেন। তাও ছাপা হলো। এরপর তো নিয়মিত কবিতা ছাপা শুরু ইন্ডিয়ান আর্মীতে যোগদান করেন। এবং ১৯২০ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত এ চাকুরি করেন। কোথাও কোথাও এপ্রিল মাসের কথা উল্লেখ আছে।

এ প্রসঙ্গে সওগাত সম্পাদক বলেন, আমার জনামতে নজরগুল তিন বছর মিলিটারীর চাকরী করেন। তথ্য সূত্রে জানা যায় তিন বছরের মাথায় নজরগুলের পদ্দোন্নতি ঘটে এবং তিনি ব্যাটেলিয়ন কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলিদার হিসেবে চাকুরি থেকে ইস্ফাদ দেন।

**মূলত:** নজরগুল পারিবারিক ভাবেই কঠিন দারিদ্র্যাতর মধ্যে দিয়ে দিনাতিপাত করেন। একই সঙ্গে শৈশব থেকে সোনালী মৌবন পর্যন্ত বার বার মানসিকভাবে পর্যুদন্ত হয়ে ভেঙ্গে থান থয়ে যান। ১৮৯৯ সালের ২৪শে মে নজরগুলের জন্ম। কিন্তু মাত্র ৯ বছর বয়সে ১৮৮০ সালে তিনি পিতৃহারা হন। বাবা কাজী ফকির আহমেদ ছিলেন স্থানীয় মসজিদের ইমাম। একজন মসজিদের ইমামের আয়ে একটি সংসার স্বচ্ছল ভাবে চলার কথা নয়। নজরগুলু ছিলেন তিন ভাই এক বোন। পিতার মৃত্যুর পর নজরগুল মসজিদে মোয়াজিন হিসাবে কাজ নেন। তখন থেকেই তাঁর ডাক নাম হয় দুখু মির্ঝা। রোজগারের পাশাপাশি নজরগুল আবার ভর্তি হন ষষ্ঠ শ্রেণীতে। কিন্তু দারিদ্র্য তাকে আবার কষাঘাত করে। আবার শিশু শ্রম।

এবার কাজ নেন রুটির দোকানে। স্কুল থেকে বিদায় নিয়ে আসানসোলের একটি চারুটির দোকানে সামান্য বেতনে ফরমায়েস খাটেন। স্কুলমুখী সোনালী অংকন এবং সুন্দর ভবিষ্যত বিনির্মাণের ভিত রচনার মুহূর্তটি নজরগুলকে কাটাতে হয় রুটির স্যাঁতস্যাঁতে দোকানে। কিন্তু যার চেতনা ও অস্থিমজ্জায় শিক্ষিত হওয়ার স্পন্ন, যার ভেতর থেকে ফিনকি দিয়ে উদগিরণ ঘটবে সহস্র বছরের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, তাকে কি চারুটির দোকানে মানায়। তাই তিনি ফরমায়েসের কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যান ময়মনসিংহের দরিদরামপুরে। ১৯১৪ সালে তিনি আবার ভর্তি হন স্কুলে। দশম শ্রেণীতে উঠে ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্যও প্রস্তুতি নেন। জানা যায় তিনি। প্রিটেষ্ট পরীক্ষাও দিয়েছিলেন। ১৯১৭ সালে যোগ দেন আর্মীতে। আর তখন থেকে শুরু হয়

তার সৃজনশীলতা।

দুখ মিএও নজরুল হয়ে উঠলেও মানসিক কষ্ট পাহাড় সমান প্রাচীর তৈরী করে তাঁর চারিদিকে। যুদ্ধ শেষে বেঙ্গল রেজিমেন্ট বিলুপ্ত হলে নজরুল ইস্তফা দিয়ে ফিরে আসেন কোলকাতায়, শুরু হয় সাহিত্য আর সাংবাদিকতা, যোগদেন সওগাতে।

১৯২১ সালের ১৮ জুন নজরুল কুমিল্লা জেলার দৌলতপুরে সুপরিচিত মুসলিম প্রকাশক আলী আকবর খাঁর মেয়ে নার্গিসকে বিয়ে করেন। কিন্তু সে রাতেই নজরুল পালিয়ে যান দৌলতপুর থেকে। যার রহস্য আজও গবেষকরা উদ্ঘাটন করতে পারেননি। তবে গ্রামোফোন রেকর্ডিং কোম্পানীতে যোগদানের পর অর্থাৎ বিয়ের ১৬ বছর পর নজরুল নার্গিসকে একটি পত্র লিখেছিলেন। যা বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত নজরুল রচনাবলীর প্রথম সংক্রণে স্থান পায়নি। পরবর্তীতে একাডেমীর বার্ষিক সাধারণ সভায় আজীবন সদস্য হিসেবে আমি এমন একটি উল্লেখযোগ্য চিঠির প্রসঙ্গে অভিযোগপূর্ণ এবং কর্তৃপক্ষের নজরুল বিষয়ক ঔন্ত্যতিকতা নিয়ে বক্তব্য রাখি। যা বাংলা একাডেমীর বার্ষিক রিপোর্টেও প্রকাশিত হয় কিন্তু পরবর্তী সংক্রণে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ দীর্ঘ চিঠি সংযোজন করা হয়েছে কিনা।

যা হোক, নজরুলের প্রসঙ্গে ফিরে যাই। নজরুল জীবিকার জন্য যেমন মসজিদের মোয়াজিন, চা রঞ্চির দোকানে ফুট পরমায়েস খাটা, বার বার স্কুল বিমুখ হওয়া আর্মীতে যোগদান, গ্রামোফোনে চাকরিসহ নানাভাবে চেষ্টা করেছেন উপাজিনের। তেমনি নার্গিসের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর মানসিক যন্ত্রণা নজরুলের সব সুখ কেড়ে নেয়। তিনি বিয়ে করেন প্রমিলা দেবীকে। কোন কোন সূত্র মতে প্রমিলা দেবী ঢাকার মানিকগঞ্জের মেয়ে। তার ডাক নাম দেলম চাঁপা। যে নামে নজরুলের একটি কাব্যথারের নামকরণও করেছেন। নজরুলের মা মারাযান ১৯২৮ সালে। মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়েন নজরুল কিন্তু তার মাত্র ১ বছর পরই মৃত্যুবরণ করেন পুত্র বুলবুল চার বছর বয়সে। সব্যসাচীর তখন ৫ মাসের শিশু। এই মানসিক আঘাত নজরুলকে তহবিল করে দেয়। তিনি লিখেন ‘যুমিয়ে গেছে শান্ত হয়ে আমার গানের বুলবুল’ বিখ্যাত গানটি। পরবর্তীতে অনুরূপ জনপ্রিয় করেন। ১৯৩৯ সালে মারা যান স্ত্রী প্রমিলা দেবী। নজরুলের পাঁজর ভেঙ্গে যায়, ক্ষরণ হয়।

রাজনীতি করতে গিয়ে জেল খাটেন। তার সেই ‘রাজ বন্দীর জবানবন্দী, একটি ঐতিহাসিক দলিল এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য হিসেবে স্থান করে নিয়েছে।

সংক্ষেপে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, দুখ মিএও জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দুঃখকেই পরমাত্মায়ের মতো আলিঙ্গন করে রেখে ছিলেন।



সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসির উদ্দিনের মুখোমুখি শরাফুল ইসলাম

8.

বিপ্লব এবং মানুষ মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। কখনো বিপ্লব হয় মানুষের মতো। সভ্যতার সিঁড়ি অতিক্রম করে বিপ্লবের মতো মানুষগুলো কালজয়ী হয়ে আছেন। কারণ তাঁরা কালকে কজা করে আধুনিকায়নের আলোকজ্ঞল অধ্যায়গুলো রচনা করেছেন। তাই যুগে যুগে এই মানুষগুলো পথিকৃত হয়ে থাকেন। কখনো ক্রোধ, কখনো আক্রোশ কখনো বিদ্বেষ কিংবা অধিকার- এইসব মানুষের মনন জগতকে আলোড়িত কিংবা আন্দোলিত করেছে। আর এই ক্রোধ কিংবা আক্রোশ থেকেই বিপ্লবাত্মকভাবে দেশ সমাজসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সোচ্চার উচ্চারণে সুবর্ণ প্রাণি অর্জনের লক্ষ্যে শান্তি হয়েছেন সংক্ষারকগণ। তাঁদের সেই উৎসারন থেকেই আজ আমরা ব্যাপক বিস্তৃতির রবিকরোজ্জ্বল সমাজ প্রতিষ্ঠার দিগন্ত স্পর্শ করার প্রয়াস পাচ্ছি।

আমাদের সমাজ বিপ্লব কিংবা সংক্ষারে যে ক'জন মানুষ অনুসরণীয় হয়ে আছেন, শর্ত বর্ষ প্রাচীন আধুনিক মানুষ মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন তাঁদের অন্যতম একজন। ১৯১৮ সালে ক্রোধ কিংবা আক্রোশ থেকে 'সওগাত' প্রকাশ করে তৎকালীন মুসলমান লেখকদের জন্য যে সোনালী ইতিহাস রচনা করেছেন, ১৯২৭ সালে 'সওগাত মহিলা সংখ্যা' প্রকাশ করে তাঁর জীবনের দ্বিতীয় বিপ্লব ঘটান। পরবর্তীতে চালিশ দশকে অর্ধাং ১৯৪৫ সালে মহিলাদের কাগজ 'সাঙ্গাহিক বেগম' প্রকাশনা ছিল মোহাম্মদ নাসির উদ্দিনের তৃতীয় বিপ্লব। যা ছিল বাংলা সাহিত্যে মুসলিম মহিলা লেখক সহ-নারী লেখক এবং নারী সমাজের কাছে আলোক বর্তিকার মতো।

কেউ জানে কেউ জানেনা ১৯

সওগাত প্রকাশ কালে পত্রিকায় মহিলাদের ছবি ছাপা নিষিদ্ধ ছিল। বিশেষ করে মুসলিম মহিলাদের। এই ছবি ছাপা নিয়ে মোহাম্মদ নাসির উদ্দিনের মুখ থেকে শোনা একটি ঘটনা পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি।

তখন ঢাকার এক মহিলা, নাম ফজিলতুন্নেছা। আই, এ পাশ করেছেন। সওগাত অফিস তখন কোলকাতায়।

মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন ঢাকা শহরের একজন মুসলিম মহিলার আই, এ পাশ করার খবর জানতে পেরে দারকণভাবে আলোড়িত হন। বহু কষ্টে গোপনে এই মহিলার একটি ছবি সংগ্রহ করেন এবং তা পরবর্তী সংখ্যা সওগাতে প্রথম শিক্ষিত মুসলিম মহিলা শিরোনামে ছেপে দেন। চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে যায়। ফজিলতুন্নেছা নিজের ছবি পত্রিকায় দেখে আনন্দে আত্মহারা।

মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন বলেন, মহিলার ছবিসহ সংবাদ ছাপা হওয়ার পর চারিদিকে ব্যাপক হৈ চৈ পড়ে গেল। আমিও কৃতকার্য হয়েছি মনে করে অনেকটা সন্তুষ্টবোধ করছি। কিন্তু এই আনন্দের সময় সরকার বাহাদুর থেকে আপত্তি আসে এবং সওগাত নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ঠিক এই সময়ে ঢাকা থেকে একটি পত্র আসে আমার অফিসে। খুলে দেখি সেই মহিলার চিঠি। যাকে নিয়ে এত তোলপাড়। মহিলা লিখেছেন, আমি নাকি অনেক সাহসী এবং প্রগতিশীল। তিনি আমার সঙ্গে কোলকাতায় এসে দেখা করতে চান। যা হবার হবে এই মানসিকতা নিয়ে মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন মহিলাকে পাল্টা পত্র দিয়ে আমন্ত্রণ জানান দেখা করার জন্য। এরপর কিছুদিন যেতে না যেতেই একদিন মহিলা এসে হাজির সওগাত অফিসে। পিয়ন এসে সম্পাদক নাসির উদ্দিনকে বলেন, স্যার আপনার সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছেন।

-যাও ভেতরে নিয়ে এসো।

-স্যার, আপনাকে ভেতরে যেতে বলেছেন। পিয়নের মাধ্যমে কক্ষে ঢোকার অনুমতি পাওয়া মাত্র সরাসরি মোহাম্মদ নাসির উদ্দিনের মুখেমুখি। মুখ থেকে সরালেন বোরখার নেকাব। নাসির উদ্দিন তাকিয়ে দেখেন, এই সেই মহিলা। যার জন্য সরকারের রোধানলে পড়েছেন তিনি। বললেন, বসুন।

মহিলা বসলেন।

-আমার সঙ্গে কি জন্য দেখা করতে এসেছেন? মহিলার ধারণা ছিল মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন একজন বয়স্ক, শক্ত মস্তিত, আলখেল্লা পরিহিত ব্যক্তি হবেন। কিন্তু শার্ট-প্যান্ট পরা স্মার্ট একজন মানুষ নাসির উদ্দিন- দেখা মাঝেই মহিলার উৎসাহ আরোও বেড়ে গেলো।

-আমি উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য বিলোত যেতে চাই। আপনাকে এর ব্যবস্থা করে দিতে হবে। একি বলছেন আপনি। এটা কোনভাবেই সম্ভব নয়। সরকার বাহাদুর আমার

বিরুদ্ধে কঠিন এ্যাকশনে যাচ্ছে। সওগাত নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আপনি দয়া করে ঢাকা চলে যান। আপনি আমরা ছবি ছাপাতে পেরেছেন। এখন আপনি আমাকে বিলেত যেতেও সাহায্য করতে পারেন। তা কোনভাবেই সম্ভব নয়। আমি ঢাকা থেকে একা কোলকাতা পর্যন্ত এসেছি। আমি বিলেতেও যেতে পারবো। আর আপনি যদি আমার জন্য এটা না করেন- তবে আমি আত্মহত্যা করবো। এই বলে মহিলা অবোরে কাঁদতে লাগলো। বুকের মধ্যে অংগীর্বী মানসিকতায় প্রচন্ড বিশ্বাসী মানুষটি শেষ পর্যন্ত বললেন; ঠিক আছে। আমি চেষ্টা করে দেখবো। আপনার কাগজপত্র রেখে এখন ঢাকা চলে যান।

আশ্চর্ষ হয়ে মহিলা রওনা দেন ঢাকার উদ্দেশ্যে।

বুকের মধ্যে অনেক সাহস এবং শক্তি সঞ্চয় করে নাসির উদ্দিন পরের দিনই গিয়ে হাজির হলেন খান বাহাদুর আবদুল লতিফের অফিসে। পাইক পেয়াদারা খান বাহাদুরকে জানালেন, সওগাত সম্পাদক দেখা করতে এসেছেন। এই খবর শুনে নবাব লতিফ মুচকি হেসে আত্মত্পৃষ্ঠি নিলেন যে, শেষ পর্যন্ত মহিলার ছবি ছাপার অপরাধে ক্ষমা চাইতে এসেছেন। থেশ মেজাজে নবাব লতিফ তার কক্ষে ঢাকেন মোহাম্মদ নাসির উদ্দিনকে। কুশল বিনিময়ের পর ক্ষমা চাইতে আসার ইংগিত বুঝতে পেরে নাসির উদ্দিন বলেন, আমি এসেছি অন্য একটি কাজে। এই বলে খান বাহাদুরের টেবিলে মহিলার কাগজপত্র রেখে বলেন, তিনি উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য বিলেত যেতে চান। কিন্তু আপনার সম্মতিপত্র ছাড়া তা সম্ভব নয়। তেলে বেগুনে জুলে ওঠেন খান বাহাদুর আবদুল লতিফ। বলেন, আপনি এই মুহূর্তে সাতবার তওবা করে বিদায় হন। আর অপেক্ষা করুন আপনার সওগাতের পরিণতি দেখার জন্য।

খান বাহাদুরের এই উদ্জেনা সাংবাদিক নাসির উদ্দিনও সহজভাবে না নিয়ে সমানভাবে উচ্চকঠো বলেন, আমিও পত্রিকার লোক। আমিও পরবর্তী সংখ্যায় দেশবাসীকে জানিয়ে দিব যে, আপনি একজন শিক্ষা বিরোধী মানুষ। দেশের মানুষ শিক্ষিত হোক তা আপনি চান না। এই বলে হন হন করে খান বাহাদুরের অফিস থেকে বেরিয়ে আসেন সওগাত সম্পাদক।

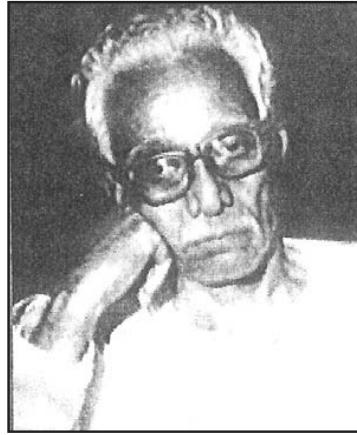
কিন্তু মাত্র তিনি চারদিন পরই খান বাহাদুর আবদুল লতিফের অফিস থেকে খবর এলো, মোহাম্মদ নাসির উদ্দিনকে তার অফিসে গিয়ে দেখা করতে বলেছেন। সম্ভবত খান বাহাদুর কঠিন কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই ভাবনা মাথায় নিয়ে তার অফিসে গিয়ে হাজির হলেন নাসির উদ্দিন। বসে আছেন অভ্যর্থনা কক্ষে একটু পরে সরাসরি খান বাহাদুর নিজে এসে হাজির। বললেন, নাসির উদ্দিন সাহেবে আসুন আমার কক্ষে। মুখে মিটিমিটি হাসি দেখে নাসির উদ্দিন কিছু বুঁবে উঠতে পারছেন না। যার সঙ্গে মাত্র ক'দিন আগে বাক-বিত্তন হলো, যার হাতে প্রজাতন্ত্রের ছবি কাঠি। যার হৃকুমে উঠ-বস করে সবাই তার মুখে এমন হাসি, নিশ্চয়ই এর পেছনে কোন দুঃসংবাদ রয়েছে। নানান ভাবনায় মনের মধ্যে তোলপাড় হয়ে যাওয়ার এই মুহূর্তে খান বাহাদুর সীল মোহর যুক্ত একটি কাগজ বের করে বললেন, এই নিন।

নাসির উদ্দিন সেই দিনের স্মৃতি হাতড়িয়ে বলেন ঠিক সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল আমার সওগাত নিষিদ্ধকরণের চিঠি আমাকে ডেকে, আমার হাতেই তুলে দিচ্ছে। আর এতক্ষণের খান বাহাদুরের খোশ মেজাজের হাসি, অভ্যর্থনা কক্ষে স্বশরীরে গিয়ে আমাকে তার নিজ কক্ষে আমন্ত্রণ জানানো সবাই সওগাত নিষিদ্ধকরণে তার বিজয়ের বহিপ্রকাশ। কিন্তু খান বাহাদুর নাসির উদ্দিনের সব ভাবনার অবসান ঘটিয়ে বললেন, ‘এটি সেই মহিলার বিদেশ যাওয়ার অনুমতি পত্র’।

মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন বলেন, তখন আমি অনেকটা আবেগে আপ্ত হয়ে পড়ি। মনে হলো, কল্যাণকর কিছু করতে গেলে সাফল্য আসবেই। আমি আমার বিজয়ের পত্র নিয়ে দ্রুত পাঠিয়ে দিলাম ঢাকায়। মহিলার আনন্দ দেখে কে। তিনি বিলেত যাওয়ার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে যাওয়ার ঠিক দু'দিন আগে আমার অফিসে এসে হাজির। আমাকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাতে এসেছেন। তখন আমি ভাবলাম এত বড় একটা সাফল্যের ইতিহাস তৈরী হতে যাচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম মুসলিম মহিলা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য বিলেত যাচ্ছেন। তাই তার একটা বিদায় সংবর্ধনার আয়োজন করি।

প্যান্ডেল সাজানো হলো। গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত হচ্ছেন। আর কিছুক্ষণ পরই শুরু হবে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। মিষ্টি বিতরণ করা হবে। ঘোষের দোকানে মিষ্টির অর্ডার দেয়া আছে। অন্য কেউ মিষ্টি আনতে যেতে চাইলেও আমি ভাবলাম এমন একটা সাফল্যের মিষ্টি আমি নিজে গিয়েই নিয়ে আসবো। ঘোষের দোকানে গেলাম। কয়েক হাত্তি মিষ্টি নিয়ে টমটমে করে যাচ্ছি সংবর্ধনার প্যান্ডেলের দিকে। আর মাত্র পাঁচ-সাত মিনিটের পথ বাকি। হঠাৎ দেখলাম বৃষ্টির মতো লাঠির আঘাত আর বাঁশের বাড়ি। মহিলাদের বেপার্দা করে বিলেত পাঠাবে.... মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন বলেন এর পর আমার আর জ্ঞান ছিল না। বিকেল সন্ধ্যা রাত পেরিয়ে পরের দিন সকাল। সারা শরীরে ব্যান্ডেজ। সারা শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা। ডাক্তারের সকল বারণ উপেক্ষা করে ছুটে গেলাম সেই সংবর্ধনা প্যান্ডেলের কাছে। কিন্তু কোথাও কেউ নেই, প্যান্ডেলও নেই।

নাসির উদ্দিন বলেন, এর মাস দু'য়েক পর সওগাত অফিসে একটি চিঠি এলো বিলেত থেকে লিখেছেন সেই মহিলা। তিনি লিখেছেন; আমার জন্য এত কিছু করার পর আপনি মিষ্টি আমার নাম করে পালিয়ে গেলেন কেন? আজও বুবাতে পারলাম না। আপনার জন্যেই আমার বিলেত আসা। অথচ আপনি সব আয়োজন করে নিজেই কিনা পালিয়ে গেলেন।



কবি আব্দুল কাদির

৫.

আত্মপ্রতির বিষয়টি সম্পূর্ণ আপেক্ষিক। আনন্দ উৎসারণের বিষয়টিও সবার কাছে সমান আবেদন রাখতে পারে না। মানুষের গতি প্রকৃতি, আচার রীতি-নীতি অর্থাৎ সামাজিকভাবেই পৃথকীকরণের বিষয়টি সুস্পষ্ট। সেই ক্ষেত্রে আমার উপলব্ধি এবং চেতনা হয়তো বা অন্য কারো কাছে আবেদনহীনও হতে পারে। তবুও আমি স্বগৌরবে আজও অনুভব করি তিনজন মহিমান্বিত মানুষের বার্ধক্য হস্তের স্বল্পকালীন অবলম্বনের ঘটনা। একজন কবি আব্দুল কাদির। অন্যজন বাংলাদেশের চারশিল্পের সোনালী পুরুষ এস এম সুলতান। এবং তৃতীয় জন স্বনামখ্যাত সঙ্গীতকার আব্দুল হালিম চৌধুরী। তিনজনই বার্ধক্যজনিত কারণে আমার ক্ষেত্রে ভর করে হেঁটেছেন কয়েক মুহূর্ত পথ। এটাই আমার পরম তৃষ্ণির চরম মুহূর্ত হিসেবে স্যতন্ত্রে রেখে দিয়েছি অনুভূতির যাদুঘরে। আমার পেশাগত জীবনে দেশী বিদেশী অসংখ্য খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি হয়েছি। হ্যান্ডসেইক করেছি বিশ্ববিখ্যাত মানুষগুলোর সঙ্গে। কিন্তু ক্ষেত্রে ভর করে সামান্য পথ অতিক্রম করে সহযাত্রী হওয়ার অনুভূতি সম্পূর্ণ আলাদা। বাংলা সাহিত্যে প্রতিথ্যশা কবি আব্দুল কাদিরের নাম কিংবা তাঁর সৃষ্টি সমকালীন সাহিত্য জগতের অনেকেই গুরুত্বের সঙ্গে মনে রাখেন। বাংলাদেশের সাহিত্য সঙ্গীত কিংবা শিল্পকলার ক্ষেত্রে অনেকেই ছিলেন, যাঁদের গৌরবমণ্ডিত সৃজনশীলতার কাছে আমাদের হাদ্য, মন ও চিন্তাকে অবনত করে সম্মান জানানোর বিকল্প নেই। কিন্তু আমরা তা করিনি। করেনি আমাদের অঞ্জরাও।

যাঁদের লেখা পাঠ্যপুস্তকে অধ্যয়ন করে আমাদের বিকাশের যাত্রা শুরু হয়েছিল, ইতিহাসের সামান্য উপাদান ছাড়া তাঁদের কোন অবদানকেই আমরা কোনো মূল্যায়ন করি না। যেই কারণে কবি গোলাম মোস্তফা, কবি ফররুর আহমদ, কবি হাসান হাফিজুর রহমান কিংবা সিকান্দার আবু জাফরের মতো লেখকদের নিয়ে এখন আর কারও কোন উৎসাহ নেই। চারিত্রিকভাবে কিছু বিষয় আমাদের স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন কোন রাষ্ট্রপতির মৃত্যু কিংবা জন্মদিনে আমরা দলীয় সংকীর্ণতার বাইরে গিয়ে একটি বিবৃতি দিয়েও সম্মান জানাই না।

অথচ তিনি একজন রাষ্ট্রপতি ছিলেন। যা ইতিহাস থেকে কোন দিনই মুছে ফেলার জিনিস নয়। তেমনি সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এই প্রথার কোন ব্যতিক্রম নেই। মরহুম জননেতা মাওলানা ভাসানীর জন্ম মৃত্যু দিবস অনেকটা গোপনেই চলে যায়। শের-ই-বাংলা এ কে ফজলুল হকের জন্ম মৃত্যু তারিখ অনেকে ভুলেই গেছে। হোসেন পত্রিকা ইতেফাকে প্রতি বছর শুধুর সঙ্গে স্মরণ করলেও সরকারীভাবে কোন অনুষ্ঠান নেই। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক বঙ্গবীর ওসমানীর বিষয়টিও রাষ্ট্রীয়ভাবে স্মরণ করা হয় না। এর মূল কারণ হচ্ছে, রাজনৈতিক বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ধারা।

সর্বক্ষেত্রেই এই কুলষিত রাজনৈতিক ধারার রাহগাসে সম্মানিত মানুষগুলোকে অসম্মানিত করা হচ্ছে। জগদীশ চন্দ্র বসু, মাইকেল মধুসূধন দত্ত, কবি জলীয় উদ্দিম-সবাই আজ আমাদের কাছে অপাঠ্য। সুকান্ত কিংবা কায়কোবাদ, জীবনানন্দ কিংবা মীর মশাররফ হোসেন- সবাই আজ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে চর্চা এবং স্মরণের অভাবে।



ঢাকা বেতারের একটি অনুষ্ঠানে (বাঁ থেকে) কবি আহসান হাবীব, কবি ফররুর আহমদ, কবি আবুল হোসেন, কবি বেগম সুফিয়া কামাল, কবি শামসুর রাহমান ও কবি আবদুল কাদির

একই ধারায় হারিয়ে যাচ্ছেন কবি আবদুল কাদির, যিনি সর্বপ্রথম কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমস্ত লেখা সংগ্রহ করে ‘নজরুল রচনাবলী’ সম্পাদনা করেছিলেন। যার

কারণে বাংলা একাডেমী আজ অনেকটা পূর্ণাঙ্গ ‘নজরঞ্জ রচনাবলী’ প্রকাশ করতে পারছে।

১৯৮২ সালের ৮ই মে কবি আবদুল কাদিরের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা তৎকালীন ‘সাংগীতিক সচিত্র স্বদেশ’ কার্যালয়ে। ২৯, পুরানা পল্টনের চারতলা থেকে প্রকাশিত হতো পত্রিকাটি। এই পত্রিকাতেই প্রথম ‘বিদেশে বসে স্বদেশের জন্য লেখা’ শিরোনামের লিখেছিলেন আবদুল গাফফার চৌধুরী। এম আর আখতার মুকুলের চরমপত্রের স্মৃতিচারণ ছাপা হয়েছিল স্বদেশে। মুকুল ভাইও প্রায়ই আসতেন এখানে। উচ্চস্বরে কথা বলতেন। তিনি অফিসে এলে মনে হতো সরগরম একটি আভ্যন্তরীণ। দারুণ জমেও উঠত বিকেলগুলো।

যাই হোক, কবি আবদুল কাদিরকে দেখে আমার আগ্রহের শেষ নেই। সাদা চুল, উচ্চতা সম্পন্ন মানুষটি বেশ বার্ধক্য আক্রান্ত।

সবার সঙ্গে বসেই কথা বললেন দীর্ঘক্ষণ। অতঃপর জাকি ভাই’র রুমে। জাকি উদ্দিন আহমেদ। তিনি ছিলেন কাগজটির সম্পাদক। মোশারফ হোসেন ব্যবস্থাপনা সম্পাদক। নির্বাহী সম্পাদক ছিলেন রফিক ভুঁইয়া, ড. মিজানুর রহমান শেলী ছিলেন উপদেষ্টা সম্পাদক। এছাড়া বিভিন্ন পদে ছিলেন ইউসুফ শরীফ, খন্দকার হাসনাত করিম, ফায়জুস সালেহীন, সৈয়দ সাজাদ হোসেন, আব্দুল হাই শিকদার, রহমান মুখলেস সহ আরো অনেকে। আমি তখন বাংলা সাহিত্য নিয়ে অনার্সের ছাত্র। পাটটাইম সাংবাদিকতা করি। কবি আবদুল কাদির হাসি মুখে বেরিয়ে এলেন সম্পাদকের কক্ষ থেকে। সম্পাদক জাকি ভাই নিজেও তাকে সম্মান জানাতে বেরিয়ে এলেন। কবি আবদুল কাদির বললেন, আমি এখন ইসলামিক ফাউন্ডেশনে যাবো। আমাকে যদি কেউ একটু সাহায্য করতেন- তাঁর কথা শেষ না হতেই বেশ ক’জন একবাক্যে বললেন, শরাফুল যাবে তাঁর সঙ্গে। সবাই হাসলেন। জাকি ভাই বললেন পিলজ শরাফুল। জাকি ভাইকে আমি অত্যন্ত সম্মান করি। কারণ অফিস ছাড়াও যখন অন্য কোথাও দেখা হয়েছে, তখনও তার আচরণ এতটাই সুমধুর, যা মনের অজান্তেই সম্মান এসে যায়। আর যে মানুষটি আমাকে স্নেহের চাদরে জড়িয়ে রেখেছেন, তিনি খন্দকার হাসনাত করিম। আর এই দু’জনই একবাক্যে অনুরোধ করলেন, কবি আবদুল কাদিরকে ইসলামিক ফাউন্ডেশনে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

আমার প্রতিবেদন জমা দিয়ে রওনা দিলাম পরম শ্রদ্ধেয় কবিকে নিয়ে। সিঁড়িতে পা রেখেই হাত রাখলেন আমার কাঁধে। সেই থেকে ইসলামিক ফাউন্ডেশন পর্যন্ত। দিলরূবা’র বিখ্যাত লেখক, ঐতিহাসিক মাহেনও পত্রিকার সম্পাদক কবি আবদুল কাদির সারা পথ হাঁটতে হাঁটতে বললেন, আমরা সবকিছু সহজেই ভুলে যাই, সবকিছুতেই দোষ খুঁজি বিতর্ক সৃষ্টি করে। এই দু’টি দিক পরিহার করতে পারলে আমাদের জাতিগত সমৃদ্ধি সারা পৃথিবীতে অগ্রগামী হতো।

তার কথার সূত্র ধরে আমি ও প্রসঙ্গ টানতে থাকি। শুনতে চাই তার আরও কিছু কথা। তিনি বলেন আমাদের মূল্যবোধকে সংরক্ষণ করতে হবে। আমাদের ঐতিহ্যকে রক্ষা

করতে হবে। আমাদের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হলে চলবে না।

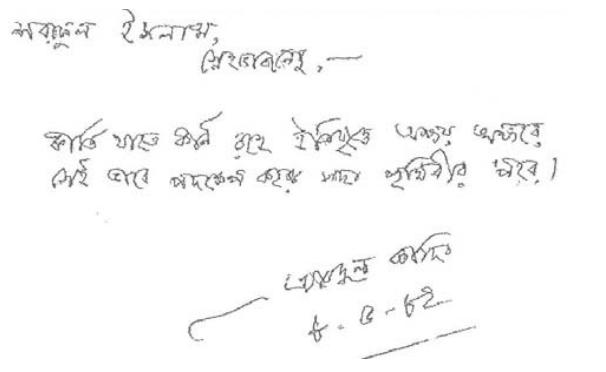
কবি আবদুল কাদির বলেন, আমি যখন নজরুল রচনাবলী সম্পাদনা করি, সমালোচনার বাড় ওঠে গেলো এক মহলে। আরেক মহল বাহবা দিল। এমন একজন লেখকের লেখা নিয়ে রচনাবলী এত সহজেই সম্পন্ন হবে না- এটাই স্বাভাবিক। কাজটা শুরুতো করলাম। পরবর্তীতে গবেষণা বাঢ়বে, নজরগুলের অনেক অজানা অধ্যয় আবিষ্কৃত হবে- তা আবার রচনাবলীতে সংযোজন হবে। এতে তো কঠিন সমালোচনার বিছু নেই।

কবি আবদুল কাদির বলেন, আমি রোকেয়া রচনাবলী সম্পাদনা করেছি। ইসমাইল হোসেন সিরাজী সাহেবের লেখা নিয়ে ‘সিরাজী রচনাবলী’ করেছি এবং একজন সুলেখক কাজী এমদাদুল হক রচনাবলী করেছি। এগুলো কিন্তু জাতির কল্যাণার্থেই করা। এক সময় এই সব রচনাবলী জাতীয় সম্পদে পরিগত হবে বলে আশা করি।

কবি আবদুল কাদির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেছেন, পেশা হিসেবে কিছুকাল শিক্ষকতা করেছেন। তারপর মাহেনও পত্রিকার সম্পাদক। ১৯৭৬ সালে তিনি একশে পদক পান। স্বাধীনতা পদক লাভ করেন ১৯৮৩ সালে। ২৯ পুরানা পল্টন থেকে বায়তুল মোকাররম কিংবা ইসলামিক ফাউন্ডেশন খুব একটা দূরে নয়। রিস্কায় গেলে ৫ মিনিট। পায়ে হেঁটে দশ মিনিট। কিন্তু আমাদের লেগেছিল প্রায় ৪০ মিনিট। কারণ প্রবীণ কবি একদিকে আমার কঙ্কনে ভর করে হাঁটছেন। কারণ তিনি রিস্কায় উঠতে রাজি হননি। আর তার কথা শোনার অগ্রহে আমিও পদক্ষেপণ করি অধিরে। মনে মনে ভাবি ‘উত্তর বসন্তের’ কবি যার লেখা আমার পাঠ্য ছিলো, সেই কবির হাত এখন আমার কাঁধে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে পৌছে প্রথমেই দেখা মুকিত ভাই'র (মুকিত চৌধুরী) সঙ্গে। তারপর মাসউদ-উস-শহীদ এবং তোফাজ্জল হোসেন (বিখ্যাত তুলি শিল্পী, কার্টুনিষ্ট, সরুজের দেশের সম্পাদক)। সালাম বিনিময় শেষে মহাপরিচালকের কক্ষে।

পরের দিন বিকেলে স্বদেশে গিয়ে দু'লাইনের একটি চিঠি। খুলে দেখি কবি আবদুল কাদিরের একটি কাব্যপত্র। লিখেছেন ‘শরাফুল ইসলাম স্নেহভাজনেষ্য, কীর্তি যাতে কীর্ণ রহে ইতিবৃত্তে অক্ষয় অক্ষরে সেইভাবে পদক্ষেপ করো সদা পৃথিবীর’ পরে।  
আবদুল কাদির ৮-৫-৮২



শ্রাবণ ইসলামকে লেখা কবি আবদুল কাদিরের পত্র

৬.

কবি আবদুল কাদিরের পত্র পেয়ে তাঁর জীবনী লেখার উৎসাহ বোধ করি। তিনবার মুখোয়ুখি হই কবির। সদালাপী নিরহংকার কবি উৎসাহিত বোধ করলেও তাঁর বার্ধক্যপ্রাপ্তি শরীর দীর্ঘক্ষণ বসে তথ্য দানের কর্মকুটুকে গ্রাহ্য করে না। সেকালের স্মৃতিময় দিনগুলোর সামান্য বর্ণনা দিতেই ক্লান্ত হয়ে যান কবি। জীবনের সিংহভাগ জুড়ে থাকা নজরল স্মৃতি, প্রীতি এবং সোনালী যৌবনের অধ্যায়গুলো হাতড়িয়ে ঝলমল করে ওঠে কবির মুখমণ্ডল। কিন্তু বার্ধক্যও তাঁকে বারবার পরাজিত করে। তাই তৃতীয় দিন বললেন, যদি সন্তু হয়, আমার স্মৃতিকথাগুলো অন্তত লিখে দেব আপনাকে। আশা করি কাজী নজরল ইসলাম প্রসঙ্গ সবটুকুই পাবেন। তবে সময় লাগবে বলে মনে হয়। বার বার কষ্ট করে এসে ফিরে যাবেন, তা ঠিক নয়। নিজেকে অপরাধী মনে হয়।

বললাম, জীবনী গ্রন্থ বা আত্মকথা না হলেও জীবনালেখাটুকু অন্তত সংগ্রহ করতে চাই। প্রবীণ কবির মুখে তঙ্গির হাসি দেখে বিদায় নিয়েছিলাম সেদিন। এরপর খবর এলো, কবি আবদুল কাদির ইহলোক ত্যাগ করেছেন। কবির কথা বলার রীতি, আচরণ, হাসিমুখ, মোটা ফ্রেমের চশমা আজও অম্বান আমার স্মৃতিতে।

এইকভাবে স্মৃতিতে ভাস্বর হয়ে আছেন সঙ্গীতজ্ঞ আবদুল হালিম চৌধুরী, চারু শিল্পের সোনালী পুরুষ এস এম সুলতান, কবি তালিম হোসেন, জাতীয় অধ্যাপক দেওয়ান

মোহাম্মদ আজরফ (হাসন রাজার নাতি), জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান, কবি আহসান হাবীব, আইনজ্ঞ গাজী শামসুর রহমান, প্রখ্যাত সাংবাদিক, ১৯৪৬ সালে কোলকাতায় তৈরী করা চলচিত্র ‘দৃশ্যে যাদের জীবন গড়’র পরিচালক ওবায়েদ উল হক; কোলকাতায় যার ছয় নাম ছিল হিমান্তী চৌধুরী কারণ সেই আমলে হিন্দু নাম ছাড়া চলচিত্র নির্মাণে কোন সরকারী সহযোগিতা পাওয়া যেতনা।

এই সব কীর্তিমান পুরুষদের সঙ্গে প্রায় নিয়মিত যোগাযোগ, আলাপচারিতা আমার তৎকালীন সাংবাদিকতাকে উৎকর্ষ করেছিল।

সঙ্গীতজ্ঞ আবদুল হালিম চৌধুরী মানিকগঞ্জের মানুষ। সঙ্গীত শিল্পী জানে আলম এই ওস্তাদের কাছে তালিম নিয়ে ছিলেন। জানে আলমও একই এলাকার সন্তান। ঢাকার নয়াটোলাতে তিনি ছিলেন আমার প্রতিবেশী। তাই প্রায় প্রতিদিনই একবার দেখা হতো জানে আলমের সঙ্গে। তার বাসায় ও যাতায়াত ছিল নিয়মিত। তখন দৈনিক সংগ্রামে ‘মানুষ গড়ার আঙিনা’ নামে একটি বিভাগ ছিল। আর এই বিভাগে মুক্তিযোদ্ধা এবং পপ তারকা হিসেবে জানে আলমের একটি সাক্ষাৎকার ছেপেছিলাম। কবি তালিম হোসেনসহ সঙ্গীত জগতের বেশ ক'জন শিল্পীর সাক্ষাৎকার ছাপা হয় এই বিভাগে। যা চারিদিকে সাড়া জাগিয়ে ছিল। কারণ একটি মৌলিক কাগজ হিসেবে পরিচিত এই দৈনিকে সঙ্গীত শিল্পীদের সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হওয়া অনেকের কাছেই ছিল অকল্পনীয়। কিন্তু একটি সুস্থিধারার সাক্ষাৎকার যে কোন সংবাদপত্রে ছাপা হলেই যে, তা মূলধারার সংস্কৃতিকে পজিটিভ সমর্থন, বিষয়টি অনেকেরই বোধগম্য নয়।

জানে আলম তখন জনপ্রিয় একজন শিল্পী। বিশেষ করে ‘একটি গন্ধবের লাগিয়া আল্লাহ বানাইল দুনিয়া’ গানটি তখন মুখে মুখে। এছাড়া তার গাওয়া মাইজভার্ডী গানগুলোও জনপ্রিয়তা পায়। এর মধ্যে তিনি একটি লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশের উদ্যোগ নেন। ম্যাগাজিনটির নাম ছিল ‘রাখালিয়া’। আমি এবং আমার বন্ধু গীতিকার জসীম রায়হান সহকারী সম্পাদক হিসেবে ম্যাগাজিনটি প্রকাশনায় সহযোগিতা করি। উল্লেখ্য, তখন ‘লিটল ম্যাগাজিন’ ছিল একটি আন্দোলনের সমান। আমরা যারা সাহিত্য সংস্কৃতি নিয়ে মনের মধ্যে জুলাবোধ করতাম, কিন্তু আমাদের কোন প্লাটফর্ম ছিল না, তারা এই লিটল ম্যাগাজিনের মাধ্যমে মূলধারার সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠাপন এবং নবীন প্রতিভা প্রকাশে সোচ্চার ছিলাম। যে যাই হোক, সঙ্গীতজ্ঞ আবদুল হালিম চৌধুরী থাকতেন তাঁর গ্রামের বাড়িতে। যাবো মধ্যে ঢাকা আসতেন রেডিও টেলিভিশনের প্রোগ্রাম করতে। জানে আলম বললেন, এ মহান সুরকার তার বাসায় আসবেন বেড়াতে। অতএব আমি ও আমন্ত্রিত। যথা সময়ে তার বাসায় গিয়ে দেখলাম শান্তসৌম্য স্বভাবের একজন প্রীতি মানুষ বসে আছেন বিছানায়। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর ছেলে ওস্তাদ আলী আকবর খাঁকে দেখে আমার যেমন মনে হয়েছিলো, অবিকল সেইভাবে সেই স্বভাবে বিন্ম হাসি দিয়ে সালামের উত্তর দিলেন আবদুল হালিম চৌধুরী। তারপর থেকে দীর্ঘ আলাপ, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা। চারিদিকে আজানের আওয়াজ। আবদুল হালিম চৌধুরী বললেন, ‘বাবা আমাকে একটু মসজিদে নিয়ে যেতে পারবেন? বললাম, অবশ্যই।

পাজামা-পাঞ্জাবী পরিহিত প্রবীণ সুবকার বিছানা থেকে নামার সময় আমার হাত ধরলেন। তারপর ধীরে ধীরে এগুলাম রাস্তার দিকে। সারাটা পথই হাঁটলেন আমার হাত ধরে। ওজু করতেও অনেক কষ্ট হচ্ছিল তাঁর। দু'হাত বাড়িয়ে প্রবল শক্তি দিয়ে গোঠালাম সুর সাগরকে। সব চাইতে মজার বিষয় হলো, মগবাজার খাটোলা মসজিদের সংলগ্ন রেষ্টুরেন্ট থেকে এসময়ই ভেসে আসছিল ‘দে পানা দে ইয়া এলাহী দে পানা’ হামদটি। যা এই আবদুল হালিম চৌধুরীরই কর্তৃ। আমার শরীর কাঁটা দিয়ে উঠলো। আমরা নামাজ আদায় করে ফিরে আসছি জানে আলমের বাসায়। রাস্তায় আরোরে কেন্দে উঠলেন প্রবীন সুর সাধক। আমি অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। আরও শক্ত করে ধরলেন আমার বাহু। বললেন, বাবা আমার সন্তানরাও আমাকে এভাবে যত্ন করেনা। সবাই ব্যস্ত নিজেদের ঘর সংসার দিয়ে।

আমার কোন উত্তর ছিলনা। প্রসঙ্গ ঘুরাতে বললাম, সমস্ত শিল্পীরাই তো আপনার সুরে গান করেছে। আপনি কার কঢ়ে আপনার সুরের সাঠিক আবেদন পেয়েছেন? আবদুল হালিম চৌধুরী বললেন, সবাইতো চেষ্টা করে মন প্রাণ উজাড় করে গাওয়ার জন্য। তবে সত্যি কথা বলতে কি, আমি যে মনস্তাত্ত্বিক, শৈলিক এবং মেলোডিয়াস বিষয়কে অস্তরের গভীর থেকে সৃষ্টির চেষ্টা করি, তা শাহনাজ রহমতুল্লাহ খুব সহজেই আতঙ্ক করতে পারে। সুরের সঙ্গে গায়কীর গভীর মমতা না থাকলে কখনোই কোন সুর বা গান শুনে শ্রোতারা মনের মধ্যে ক্যানভাস তৈরী করতে পারবেনা। সুরের মধ্যে মেঘ, বৃষ্টি, রোদ, সকাল-সন্ধ্যা-বিকেল সবই থাকতে হবে। সুরের সার্থকতা তখনই হয়, যখন রোদ বললে মন আলোকিত হবে, বৃষ্টি বললে ভারাক্রান্ত হবে, বিকেল বললে সূর্যাস্ত ভেসে উঠবে। মূলকথা, মনে প্রাণে আত্মায় একাকার না হলে কোন বাণীই বাস্তব মনে হয় না।

কথা বলতে বলতে ফিরে এলাম জানে আলমের বাসায়। তার এই সারাদিনের কথোপকথন তখন প্রকাশ করে ছিলাম পত্রিকায়। যার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী জীবনী গ্রন্থমালায় প্রথম ধাপেই প্রকাশ করে আবদুল হালিম চৌধুরীর জীবনালেখ্য।

পরের দিন জানে আলমের সঙ্গে দেখা হওয়ামাত্র বললেন, ওস্তাদজি আপনাকে একটি দোয়াপত্র দিয়ে গেছেন। হাতে নিয়ে খুললাম। লিখেছেন-

প্রিয় শরাফুল ইসলাম,  
আপনি সাংবাদিক ও কর্ম জীবনে দেশের, জাতির খেদমত করুন। আমি আল্লাহর  
দরবারে আপনার জন্য এই দোয়া করি।  
আবদুল হালিম চৌধুরী ৬/১০/৮২

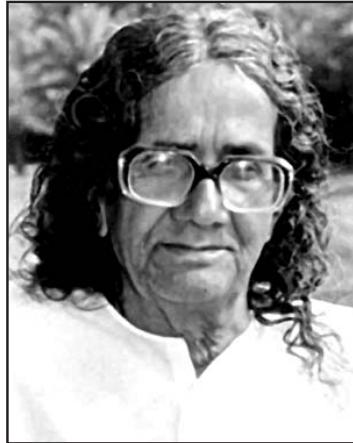
আবদুল হালিম চৌধুরীর এই দোয়াপত্র স্বতন্ত্রে রেখেছি গভীর শুন্দার সঙ্গে। কবি আবদুল কাদির এবং সঙ্গীতজ্ঞ আবদুল হালিম চৌধুরীর পত্র দু'টি আমার পাথেয়

হোক, এই ব্রত নিয়েই সামনের দিনগুলো অতিক্রম করার প্রত্যাশা।

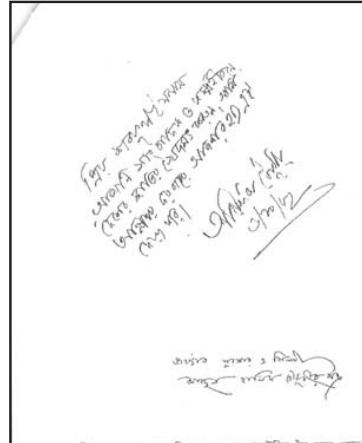
আমার কাঁধে ভর করে সামান্য শক্তি সাহায্য নিয়েছিলেন আরেকজন সুমহান পুরুষ। এই শিল্পীর একটি বিকেলের ঘটনা লিখেছিলাম কোন জাতীয় দৈনিকে। যা পরবর্তীতে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত এস এম সুলতান স্মারকগ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদনা করেছেন সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম এবং সুবীর চৌধুরী। এস এম সুলতান একটি বিপ্লবের সমান। কেউ কেউ বলে, মানুষ অনেকটা বিপ্লবের সমান। অনুজ প্রতীম লেখক মোজাম্বেল বাবু বহু বছর আগে লাল মলাটে একটি কবিতার বই বের করেছিল ‘মানুষ অনেকটা বিপ্লবের সমান’ নামে। একটি কবিতা, একটি বই। এস এম সুলতানকে দেখলে আমি তাঁকে সমার্থক করে দেখতাম। তাই তৃতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে লিখেছিলাম আজ থেকে প্রায় ২৫ বছর আগে একজন বিরহী বাটুলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল গতকাল। নাম তাঁর এস এম সুলতান। একজন মানুষ দরলী প্রতিবাদী বাটুলের নাম। চারু শিল্পের একজন সোনালী পুরুষের নাম। এর আগেও দেখা হয়েছে অনেকবার। কখনো বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতে, কখনো বাংলা একাডেমীতে, কখনো কোন আর্ট গ্যালারীতে, কখনো সেমিনারে। গতকাল চারু শিল্পের এই মরমী বাটুলের সঙ্গে দেখা কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীতে। তৃতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে এসেছেন প্রধান অতিথি হয়ে। বিকেল গড়িয়ে যাচ্ছে। অতিথিরা তখনে সবাই এসে পৌছাননি। তাই দীর্ঘ বিলম্ব। এস এম সুলতান হাতে ছড়ি নিয়ে প্রবীণ শরীরকে সঁপে দিলেন চতুর ঘেরা দেয়ালের গায়ে। ছড়ির মধ্যে খনিকটা ভর ছিল শরীরের।

এগিয়ে গেলাম চিরাচরিত নিয়মের কেশ বিন্যাসে বাটুল গাঁথার বরপুত্র এস এম সুলতানের কাছে। কুশল জানলাম। হাসলেন সেই আগে দেখা, অনেক চেনা মানুষের মতো। বললাম, আপনার শরীর কেমন? এক হাত ছড়িতে ভর করে অন্য হাত নেড়ে বললেন, ‘ভালোইতো আছি’। তাঁর সঙ্গে আরেকবার বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতে দেখা হওয়ার পর যখন কুশল জানতে চেয়েছিলাম, তখন সেই কাহলা পোশাক পরিহিত সোনালী পুরুষ ক্রেতের সঙ্গে জবাব দিয়ে ছিলেন, সত্য বলবো, না মিথ্যা বলবো? তখন তাঁর আত্মজার মতো কন্যাটি তাঁকে উত্তেজিত হতে বারণ করেন। মূলত: তখন তাকে শিল্পকলা একাডেমী ‘আর্টিষ্ট ইন রেসিডেন্স’ হিসেবে চাকরি দেয়ার নাম করে কি যেন বামেলা করেছিল। কিন্তু গতকালের সুলতান অনেক বদলে গেছেন। শরীর ভেঙে খান খান হয়ে গিয়েছে। বললাম, এখানে কষ্ট করে দাঁড়িয়ে না থেকে ভেতরে গিয়ে বসলো...। আমার কথা থামিয়ে দিয়ে বললেন, ‘না না এখানেই উদ্বেগ্ন হবে। তারপর ভেতরে হবে অনুষ্ঠান। তাই এখানে থাকাটাই ভালো।’ বললাম, অতিথিরা সবাইতো এখনো এসে পৌছাননি। তাই একটু দেরী হচ্ছে। উত্তরে তিনি বললেন, আমাদের সব কিছুইতো দেরী হয়ে যাচ্ছে। কোন কাজইতো সময় মতো শেষ করতে পারছি না। জানিনা আর পারবো কিনা।’

এবার তিনি ছড়িটি পাশে রেখে বসে পড়লেন ঘাসের ওপর। আমিও বসলাম



এস এম সুলতান



শরফুদ্দিন ইসলামকে লেখা সঙ্গীতজ্ঞ আবদুল হালিম চৌধুরীর চিঠি

মুখোয়াথি। ভাবলাম হয়তো এমন সুযোগ আর নাও আসতে পারে। নীরব-নিশ্চূপ এমন একজন মহান শিল্পীর নিঃসঙ্গতা দূর করার অজুহাতে জানতে চাইলাম, ‘চলচ্চিত্র উৎসবে প্রধান অতিথি হলেন কি ভেবে? বললেন ‘ছেলেরা সবাই ধরেছে, তাই রাজী হয়ে গেলাম।’

চলচ্চিত্র নিয়ে কখনো কিছু ভাবেন?

বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের রাজত্বে মানব কল্যাণে চলচ্চিত্রের মতো গ্রহণযোগ্য, বৃহৎ শক্তিশালী আর কোন মাধ্যম আমি দেখিনা। একটি ছবি একটি বিপ্লব ঘটাতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। ভাববেন না কথার কথা বলছি। এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তবে আমাদের দেশে শুধু নয়। সারা বিশ্বেই চলচ্চিত্রের দুটি ধারা বিরাজমান আসলে এটা শুধু চলচ্চিত্রে বলা ভুল হবে। সব ক্ষেত্রেই একই অবস্থা। ভালো আর মন্দের দ্বন্দ্ব নিয়েইতো সারা বিশ্বে সংঘাত, যুদ্ধ আর হানাহানি। চলচ্চিত্রেও এরকম ভালো-মন্দের বিরোধ রয়েছে। এবং তা থাকবেও। তবে সাময়িকভাবে খাবাপটাই প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন সৎ চলচ্চিত্র সিনেমা হলে চলে না। অথচ নাচ-গানের ছবির নাকি টিকেট ব্ল্যাকে বিক্রি হয়। তবে ভালোর কদর কিন্তু পারমাণেন্ট।

এমন কোন চলচ্চিত্রের কথা আপনার মনে পড়ে, যা নিয়ে কিছু বলতে পারেন?

কেন, জীবন থেকে নেয়া। আগেই বলেছি, একটি চলচ্চিত্র একটি বিপ্লব ঘটাতে পারে। তার প্রমাণ আমাদের জগীর রায়হানের ‘জীবন থেকে নেয়া’ আমি এই ছবির কথা কখনো ভুলবানা। এখানেই প্রমাণ হয় পেশার প্রতি মানুষের সততার মূল্য কত। সততা ছাড়া এমন ছবি করা যায় না। এই ছবিটা আমার কাছে একটি বিপ্লবের সমান মনে হয়েছে। এখানে সততা ছিল, প্রতিশ্রূতি ছিল, সৎ সাহস ছিল, যুদ্ধ ছিল।

আমাদের চারপশ্চিম নিয়ে আপার ভাবনা কি?

তাবনা আর কি? ভালো হচ্ছে কাজ। অনেক নতুন নতুন শিল্পীরা আসছেন। তাদের কাজও ভাল হচ্ছে। তারা সুযোগও অবশ্য বেশী পাচ্ছে। তবে তাদের আরও বেশী আন্তরিক হতে হবে। রাতারাতি নাম ডাক খুঁজলে চলবেনো। অনেকেই কাজ রেখে নাম ডাকের জন্য ব্যস্ত। এ

ব্যাপারে সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি ও নজর দিচ্ছে না। বরং ওখামে নানা রঙের রাজনীতি। ফলে প্রতিভাবান হওয়া সত্ত্বেও সুযোগের অভাবে প্রতিভাব প্রকৃত বিকাশ ঘটাতে পারছে না। কিছু মনে করবেন না, সবাই আসলে অসৎ হয়ে পড়েছে। সবাই বলতে সর্বক্ষেত্রে। ফলে ব্যক্তিগত সম্পর্ক এমন আকার ধারণ করেছে যে, গুণের কদর নীরবে কাঁদে। তাই প্রশাসনে সৎ মানুষের দরকার।

এই সময়ে দেশের প্রধান সমস্যা হিসেবে আপনি কোন বিষয়কে চিহ্নিত করবেন? সমস্যাতো পদে পদে। তবে আমি শংকিত যুবকদের নিয়ে। যুব সমাজকে সংযত করে মানব কল্যাণে নিযুক্ত করতে পারলেই দেশ ও জাতি সবচাইতে বেশী উপকৃত হবে। যুবকরাই তো আমাদের ভাষা প্রতিষ্ঠা করেছে। যুবকরাই তো স্বাধীনতা দিয়েছে। কিন্তু যুবকদের আমরা কিছুই দিতে পারিনি। তাই তারা এখন পক্ষিলতার পথে এগছে। যুব শক্তির পতন একটি জাতির পতনের চাইতে কম কিছু নয়। যুবকদের এই পরিস্থিতির কথা ভাবলেই আমি শংকিত হই। তাহলে জাতিকে রক্ষা করবে কারা, তাই এ ব্যাপারে বিশাল পরিকল্পনা নিয়ে সরকারের অন্তিবিলম্বে এগিয়ে আসা উচিত। অন্যথায় বিজয়ী জাতির বিপর্যয় অসম্ভব কিছু নয়।

আমাদের কথাবার্তার এ মুহর্তে বেশ ক'জন অতিথি এসে গেলেন, আয়োজকদের সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়েন উৎসব শুরুর জন্য। এস এম সুলতানও ভাবলেন, তাঁকে এক্ষুণি বুবি উঠ্টতে হবে। বললেন, কত কথাই তো বললাম, লিখে আর কি হবে। এমন সময় ডাক এলো তৃতীয় আন্তর্জাতিক চলচিত্র উৎসব উদ্বোধনে তাঁকে হোগদানের জন্য। আমার কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁঢ়ালেন। হাতে তুলে দিলাম ছড়িটা। ধীর পায়ে এগিয়ে গেলেন পায়রা ও বেলুন ওড়ানোর পর্বের অনুষ্ঠানে।



উত্তম বাহাদুর খাঁ

৭.

“বিজ্ঞান নতুন আবিক্ষারের প্রয়াস নিয়ে ব্যাপক গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতিদিন নতুন কিছু আবিক্ষার করে চমক সৃষ্টি করেছে। মানুষের জীবন যাপন সাবলীল রাখার জন্যে বহুমুখী অভিপ্রায়ে কৃতকার্যতা পাচ্ছে। মানুষকে সচল রাখার জন্যে বহুমুখী অভিপ্রায়ে কৃতকার্যতা পাচ্ছে। মানুষকে সচল রাখার জন্যে সর্ব বিষয়ে নতুন নতুন বিষয় সংযুক্ত হচ্ছে। তাই মানুষ একটু অসুখ হলেই ডাঙ্গারের কাছে যায়। সর্বক্ষেত্রেই মানুষ এভাবে বিজ্ঞানের শরণাপন্ন হচ্ছে। কিন্তু কর্তৃ সাধনা সেই সব নতুন আবিক্ষারের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন। কারণ কর্তৃ সাধনা এমনই একটা বিষয় যা সকল বিজ্ঞান ও তার সকল আবিক্ষারের উৎর্দেশ। সাধনা এমনই একটা সুগভীর চর্চা যা মননের সাথে সম্পৃক্ত। বিজ্ঞান এখানে বিমুখ। মনন শিল্পে মননের চেতনা ও চৈতন্য যতই গতীরে যাবে- সাধনা বিমুঘ চিন্ত ততই সতেজ ও প্রফুল্ল হবে।” - কথাগুলো বলেছিলেন উত্তম বাহাদুর হোসেন খান। পাক-বঙ্গ ভারতের অন্যতম মহান সঙ্গীত সাধক সরদ বাদক বাহাদুর খাঁ।

বাহাদুর খাঁ- এর মতে সঙ্গীত সাধনা একটা অলীক রূপের ঠিকানায় দীর গতিতে অনুসন্ধান করা। মন-শরীর, চেতনা-একাত্ম করে নির্বেদিত হতে হবে এই অলীক রূপের মোহনায়। চোখ বঙ্গ করে যেমন তাবৎ বিশ্বের সবকিছু অনুমান করা যায়, তেমনি নির্বেদিত প্রাণের উৎসারণে অনুধাবক করা যাবে মোহময়ী চেতনার অপূর্ব স্বরূপ। তখন আর খ্যাতির উপাসনা থাকবেনা। স্বরূপ থেকেই বিকিরণ ঘটবে সাধনার

স্ফুলিঙ্গ। সঙ্গীত সাধনার এই রীতিধারা এবং চেতনা আতঙ্ক না করলে আপন সৃষ্টির চিহ্ন কোথাও সৃষ্টি হবে না।

বাহাদুর খাঁ বলেন- এখনকার সঙ্গীত শিল্পীরা যৎ-সামান্য চর্চা করেই নাম, যশ ও খ্যাতির পেছনে ছুটছে। ফলে তাদের স্থায়িত্ব যেমন ক্ষণিকের তেমনই সৃষ্টির কোন স্থায়ী চিহ্ন সঙ্গীত ভাস্তবে দান করতে পারেনা। খরচোত্তা নদীর মত ভেসে আসে, আবার খরচুটার মতই ভেসে যায়। পলির ছিটে-ফেঁটা ও গন্ধ তাদের মধ্যে নেই। আর এই কারণেই আমাদের সঙ্গীত জগত এতটা টাল-মাটাল অবস্থায় নিমজ্জিত। অথচ আমাদের সঙ্গীতের ইতিহাস, সঙ্গীতের রত্ন-ভাস্তবে জয়াকৃত সাধকদের অবদান এখনো পাথেয় হয়ে আছে। তবে আরো একটি বিষয় আমাকে পীড়া দেয়- আর সেটি হচ্ছে এই সব সাধকদের সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় কার্পণ্যতা। যাদের সাধনাকৃত সম্পদ নিয়ে আমরা সম্পত্তির দাবীদার, তাঁদের জীবন-যাপন খুব একটা স্বচ্ছল ছিলনা। এখনো যারা সেই ধারা অব্যহত রেখে সৃষ্টির অপূর্ব মূর্ছনা সঙ্গীতের অবয়বে ঢেলে দিচ্ছেন, তাদের সাংসারিক যাতনার কাহিনী অজ্ঞাত। সরকারী পুরস্কার তাদের ক্ষেত্রে গৌণ। সরকার এইসব সঙ্গীতজ্ঞদের পুরস্কৃত করে নিজেরাই ধন্য হচ্ছেন। আম-জনতা বলছে, সরকার একটি ভাল কাজ করেছে। কিন্তু পুরস্কার আর সম্মান কিংবা শুন্দা যে সমার্থক নয় তা অনুধাবনের প্রতিয়া তাদের পরিসীমার বাইরে।

বিখ্যাত খাঁ পরিবারের উন্নত পুরুষ ওস্তাদ বাহাদুর হোসেন খাঁ সারা ভারতবর্ষে সঙ্গীতের অসাধারণ এক সোনালী আমজ্ঞাণে ১৯৮৪ সালে ঢাকা সফরে এসেছিলেন সঙ্গীতের এই প্রবাদ পুরুষ। তাঁর মুখোমুখি হয়ে এক দীর্ঘ সাক্ষাতকার প্রাপ্তি করার সৌভাগ্য হয়েছিল তখন। সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত তাঁর সান্নিধ্য অর্জনের সুযোগ করে দিয়েছিলেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর জনসংযোগ কর্মকর্তা গীতিকার আ.ব.ম ছালাটান্দিন। পদ্ধিত রবি শংকর এবং দিলীপ কুমারের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগও হয়েছিল তারই সহযোগিতায়। কারণ সরকারী সফরের গোপন কর্মসূচীর বাইরে সফরকারীদের দীর্ঘ সময় কথা বলার সুযোগ সচরাচর পাওয়া দুর্ভর। এই সফরের মাঝাখানে বাহাদুর খাঁ একদিন তাঁর ঢাকাস্থ আত্মীয় স্বজনদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ পান। তাঁর ছোট ভাই শেখ সাদী খান আমার অঞ্জ প্রতীম। তবে সম্পর্ক বন্ধুর মত। গীতিকার মনিরজ্জামান মনির, গীতিকার নজরুল ইসলাম বাবু (মরহুম), সুরকার শেখ সাদী খান আমাদের আভ্যন্তর আভ্যন্তর বিশেষ অংশ জুড়ে থাকতেন। বিশেষ করে তারা তিন বন্ধু মিলে একটি সিনেমা বানিয়েছিলেন। নাম সম্ভবত ‘মাটির ময়না’। তখন প্রায় নিত্য স্বীকৃতার বিশেষ পরিসর গড়ে উঠে। নজরুল ইসলাম বাবুর বেশীর ভাগ গানই সুর করেছেন শেখ সাদী খান। প্রায় প্রতিটি গানই আকাশ ছাঁয়া জনপ্রিয়তা পায়। সুবীর নন্দীর মেলোডিয়াস কঠে “পৃথিবীতে প্রেম বলে কিছু নেই”- সহ বাবুর প্রায় সবগুলো গানই চিরকালীন আবেদনে এখনো সঙ্গীতের সম্পদ হিসাবে টিকে রয়েছে। বাবুর আরও একটি গান ছিল- “সব কটি জানালা খুলে দাওনা”- সুর করেছিলেন আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল, গেয়েছিলেন সাবিনা ইয়াসমিন। যদিও বুলবুল এক সময় গানটিকে নিজের লেখা বলে দাবী করেছিলেন। কিন্তু শেষ



ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ'র সঙ্গে শরাফুল ইসলাম

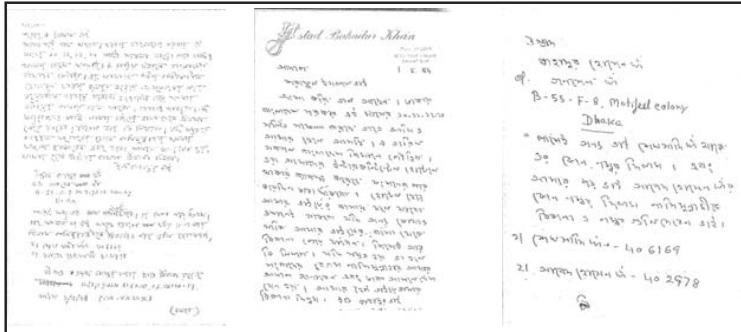
পর্যন্ত তা ধোপে টেকেনি। মনিরজ্জামান মনিরও একজন উচ্চ শ্রেণীর গীতিকার। তার লেখা গান “জীবন বাংলাদেশ আমার মরণ বাংলাদেশ”- জিয়াউর রহমান তো দলীয় সঙ্গীত হিসেবেই বেছে নিলেন।

বলেছিলাম শেখ সাদী খানের কথা। ওস্তাদ বাহাদুর হোসেন খাঁ, তারই অহজ। সরকারী সফরের এক পর্যায়ে শেখ সাদী খানের মতিবিলস্থ সরকারী বাসভবনে প্রায় সারাদিন কথা বলা এবং তাঁর সরোদের মৃচ্ছনায় অবগাহনের সুযোগ হয়। শুধু তাই নয়, ওস্তাদ বাহাদুর হোসেন খাঁ এর মত একজন ভারত উপমহাদেশখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞের বন্ধুসূলভ আচরণ আমাকে বিমুক্ত করেছে। সফর শেষে ভারত ফিরে গিয়েও তিনি আমার সঙ্গে পত্রালোপে যোগাযোগ রেখেছেন।

১৯৮৪ সালের যে মাসে চারদিন ব্যাপী এক সঙ্গীত সম্মেলনের আয়োজন করে বাংলাদেশ সরকার। তখনও ভারত থেকে আমন্ত্রিত হন ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ এবং এই আমন্ত্রণ প্রাণ্তির পরপরই আমাকে একটি পত্র লিখে অবগত করেন তাঁর ঢাকা সফরের কথা। নিচে তাঁর পত্রটি হ্রবহু তুলে ধরা হলো:

আদাপ  
শরাফুল ইসলাম ভাই

আশা করি ভাল আছেন। ঢাকায় বাংলাদেশ সরকার এই মাসের ১০,১১,১২,১৩ সঙ্গীত সম্মেলন করেছে। তাতে আমি ও আমার ছেলে আসছি। ৯ তারিখ সকালে বাংলাদেশ বিমানে পৌছাবো। ওরা আমাদের ইন্টার কন্টিনেন্টাল হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করেছে। ফাঁক্ষনের পরে কয়েকদিন ঢাকায় থাকবো। হোটেল ছেড়ে আমার ভাইয়ের বাসায় চলে যাব। ওখানেই থাকব। যদি অন্য কোথাও থাকি আমার ভাইয়ের বাসা থেকে ঠিকানা পেয়ে যাবেন। বিশেষ করে কি লিখবো। যদি সম্ভব হয় তাহলে সৎবাদের বেগম নাসিমুন্নাহারকে আমার আদাপ জানাবেন এবং ঢাকা আসলে দেখা



শরাফুল ইসলামকে লেখা উত্তাদ বাহাদুর খাঁ'র চিঠি

যেন হয়। আমার ছোট ভাইয়ের বাসার ঠিকানা দিলাম।

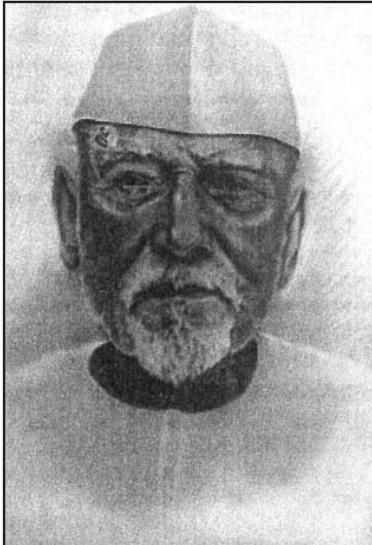
ইতি  
বাহাদুর ভাই

ওত্তাদ বাহাদুর খাঁ  
C/O তানসেন খাঁ  
B-55, F-8 Motijhill Colony  
Dhaka

পাশেই অন্য ভাই শেখ সাদী খাঁ তাকে। ওর ফোন নম্বর দিলাম এবং আমার বড় ভাই আবেদ হোসেন খাঁর ফোন নম্বর দিলাম। নাসিমুন্নাজীকে ঠিকানা ও নম্বরগুলি দিবেন ভাই।

- ১। শেখ সাদী খাঁ'ন ৪০৬১৬৯
- ২। আবেদ হোসেন খাঁ ৪০২৯৯৮

এই পত্রে ওত্তাদ বাহাদুর খানের প্যাডে ঠিকানা রয়েছে। তারিখ ১/৫/৮৪  
১২/১২/১ PALM AVENUE  
CALCUTTA- ১৯  
Phone: ৪৪২০৪৩



ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ

৮.

ভারত উপমহাদেশের সঙ্গীত আজ যাদের কারণে সারা বিশ্বে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। সেই খাঁ পরিবারের সন্তান বাহাদুর খাঁ। ভারত বর্ষের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের দিকপাল, পিতা ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁর কাছে হাতে খড়ি নেন তিনি। এর পর শিক্ষাগুরু হিসাবে বাহাদুর খাঁর দায়িত্ব নেন। তাঁর চাচা সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে খ্যাত ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ। কিন্তু শর্ত একটাই যে, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে সম্মক জন অর্জন না করা পর্যন্ত কোন মধ্যেও উঠতে পারবেন না। অর্থাৎ ওস্তাদ যখন মনে করবেন যে, শ্রোতাদের সামনে পরিবেশন করার যোগ্যতা অর্জিত হয়েছে, তখনই জনসমক্ষে একজন শিল্পী হিসাবে অভিষেক ঘটাবেন। তাই গুরুদীক্ষা শিরোধার্য করে একাহুচিংড়ে মনে নিবেশ করেন শাস্ত্রীয় জগতে।

বাহাদুর খাঁ বলেন, আমার পিতা ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁ এবং চাচা ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁর কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে এক পর্যায়ে তাঁদের অনুমতি সাপেক্ষে জন সমুখে সরোদ বাজানো শুরু করি। এবং শুরুতেই অনুধাবন করতে পারি ওস্তাদের নিষেধাজ্ঞার কারণ। ফলশ্রুতিতে বাহাবাটুকু সঞ্চয় করে নিবেদন করি ওস্তাদের করকমলে। এর পরে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে ব্যাপক বিস্তৃতির লক্ষ্যে আমার চাচাত ভাই ওস্তাত আকবর আলী খাঁর কাছে সুর সঙ্গীতের মর্মবাণী স্পর্শ করার প্রয়াসে দীক্ষা নেই।

উল্লেখ্য, বাহাদুর খাঁ সঙ্গীতে ব্যাপক জ্ঞানার্জনের পর শ্রোতাদের সামনে হাজির হওয়ার

কারণে শুরুতেই দারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন এবং শিল্পবোধের বৈচিত্র্যতা ও সৃজনশীলতার অনুসন্ধানী অগ্রযাত্রায় তাকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপর নির্মিত তথ্যচিত্রের সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে নির্বাচন করে কর্তৃপক্ষ। বাহাদুর খাঁ বলেন, “রবিঠাকুরকে নিয়ে তৈরী তথ্যচিত্রে সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পাওয়ার কারণে সুধীমহলে আমার কদর স্থায়ী হয়।”

বাহাদুর খাঁ ছিলেন, প্রখ্যাত চলচ্চিত্রকার ঝড়িক কুমার ঘটকের অতি প্রিয় একজন সঙ্গীতজ্ঞ। তাই তিনি তাঁর প্রায় সবক'টি ছবিতেই বাহাদুর খাঁকে সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে নির্বাচন করেন। এমনকি ঝড়িক কুমার ঘটক যে বাংলাদেশে “তিতাস একটি নদীর নাম” ছবি নির্মাণ করেছিলেন সেটিও সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব পান ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ। এবং একে একে সূর্বৰ্ণ রেখা, মেঘে ঢাকা তারা, সাদা ময়ূর, নতুন পাল এর সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে ব্যাপক সমাদৃত হন। মূলত: চলচ্চিত্রের সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে প্রথাগত সুরকার বা সঙ্গীত পরিচালকরাই দায়িত্ব পালন করে থাকে। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ওস্তাদরা এ দায়িত্ব সচরাচর পান না কিংবা আগ্রহী হন না। এক্ষেত্রে বাহাদুর খাঁ ব্যতিক্রম। তিনি এরপর ভারত খ্যাত চারুশিল্পী যামিনী রায়ের ওপর নির্মিত তথ্যচিত্রের ও সঙ্গীত পরিচালনা করেন। “সুর্বৰ্ণ রেখা” ছবির সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে পান শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার।

বাহাদুর খাঁ পল্লী সঙ্গীতকে মনে প্রাণে আতঙ্ক করেছিলেন। পল্লী গানের সুরকে সকল শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের উর্ধ্বে তুলে ব্যকরণের সন্ধিকটে নিয়ে গিয়েছেন। তিনি বলেন, “আবহমান বাংলার প্রায় প্রতিটি পল্লীগীতির সুরই কোন না কোন রাগাশ্রয়ী। বাংলাদেশের পল্লী গানের দরদ ভরা সুর মনকে আগুত করে, হন্দয়কে ব্যাকুল করে। আমি যত দেশে গিয়েছি, সবখানেই বাংলার পল্লীগানের সুরের মূর্ছনায় বিমোহিত হয়েছে দর্শকরা। মূলত বাংলা পল্লীগানের সুরের এমনই একটা আবহ যে, বাংলা ভাষা বা গানের অর্থ না বুঝলেও সুরের ব্যাঞ্জনায় অনেক বিদেশী সঙ্গীত বোদ্ধারা অঙ্ক সংবরণ করতে পারে না। বাংলা পল্লীগীতি তথা গ্রাম বাংলার সকল সঙ্গীত সম্পদকে আর্কাইভ করার ব্যাপক পরিকল্পনা নেয়া জরুরি।”

বাহাদুর খাঁ বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গীত ভাস্তারের সেরা সম্পদ এদেশের পল্লীগীতির সুর। তাই এই সম্পদের যত্ন নেয়া হলে সারা বিশ্বে এর মর্মবাণী পৌঁছে দেয়া সুন্দর। ব্যকরণের সব বিবেচনাতেই পল্লীগীতির সুর উর্ণীগ। আমরা যারা সঙ্গীত যন্ত্র নিয়ে বিদেশে পারফর্ম করতে যাই, রবি শংকর পর্যন্ত, সবাই বাংলাদেশের পল্লীগানের সুরকে উপস্থাপন করে থাকি এবং সত্যি কথা বলতে কি, অন্যান্য সকল ব্যাঞ্জনাকে অতিক্রম করে সবচেয়ে বেশী দর্শক প্রিয়তা পায় পল্লী সুরের মোহময়ী আবহ। ১৯৭১

সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় জর্জ হ্যারিসনের আয়োজনে রবি শংকর এবং আলী আকবর খাঁ যে কনসাটে অংশ নিয়েছিলেন, সেখানেও বাংলাদেশের পল্লী গানের ধ্যন বাজিয়ে মাত করেছিলেন আমেরিকাবাসীদের। বৃষ্টির মতো করতালীতে মুখরিত হয়ে উঠেছিলো আকাশ বাতাস।

উল্লেখ্য, পভিত্র রবিশংকর বাহাদুর খানের চাচাতো বোন অর্থ্যাং ওস্তার আলাউদ্দিন খাঁর মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু সেই রহস্যময় সংসার এবং রবিশংকরের দ্বিতীয় বিয়ে সম্পর্কে কোথাও কোন স্পষ্ট বিবরণ নেই। এ প্রসঙ্গে বাহাদুর খাঁনের কাছে জানতে চাইলে তিনি একটু অন্যমনক্ষ হন। এদিক ওদিক তাকান। তারপর বলেন, এ প্রসঙ্গ থাক। আমিও প্রসঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে আবার আলাউদ্দিন খাঁর প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপকালে তিনি বলেন, চাচাজি যখন রবি শংকরের কাছে মেয়েকে বিয়ে দেন, সুযোগ্য কন্যার সুনিপুন সেতার বাজনা রাহিত করেন। চাচা বিয়ে করেছিলেন মদন মহরি দেবীকে। তাঁর একপুত্র ও তিনি কন্যা। পুত্র আলী আকবর খাঁ। কন্যারা হলেন, সারিজা, জাহানারা এবং অন্যপূর্ণা। অন্যপূর্ণা মানে রোশনারা খান। সারিজা শৈশব থেকে রোগে আক্রান্ত ছিলেন এবং মারা যান। জাহানারা ও শুশুরবাড়ী চলে যান। কিন্তু শাশুড়ীর দূর্ব্যবহারে জাহানারা তাঁর তানপুরাট আগুনে জ্বালিয়ে দেন। এ সংবাদে আলাউদ্দিন খাঁ প্রচন্ড ব্যথিত হন এবং সিদ্ধান্ত নেন যে, অন্যপূর্ণাকে তালিম দেয়া বন্ধ করে দেবেন। এই মনস্তির করে ঘরে ফিরে দেখেন যে, অন্যপূর্ণা তার ভাই আলী আকবর খাঁ কে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তালিম দিচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে এবং কন্যার অভাবনীয় প্রতিভা দেখে আবেগাপূর্ত হয়ে পড়েন ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ। অবিশ্বাস্য প্রতিভায় তিনি আনন্দাশ্রম ফেলে বলেন, “মা, আমি তোকে আরোও শেখাবো।”

- এই অন্যপূর্ণাকেই প্রথম বিয়ে করেছিলেন, রবিশংকর। কিন্তু বিয়ের পর তিনি আর কোনদিন সঙ্গীত নিয়ে খেলা করতে পারেননি পিতার নির্দেশে। কারণ এক বনে যে দুই সিংহ থাকতে পারেন। তাই রবি আজ পভিত্র রবিশংকর, যার কারণে তিনি সব ছাড়লেন, পিতার নির্দেশে সঙ্গীত ছাড়লেন, তাকেই ছেড়ে দিলেন সেই মানুষটি।

বাহাদুর খাঁ জানান যে, অন্যপূর্ণা একাধারে সুকচ্ছী গায়িকা, সিতারের সিদ্ধহস্ত বাদিকা এবং সুরবাহারের সাবলিল অঙ্গুলি সঞ্ঘালক ছিলেন।

এই অন্যপূর্ণার কাছে বাহাদুর খাঁও তালিম নিয়েছেন। সুরবাহার এবং সরোদের সুগভীর রহস্যময়তা আতঙ্ক করা এবং আঙুলের ইশারায় যন্ত্র থেকে বোলের বিচ্ছুরণ ঘটানোর গভীর তত্ত্ব শিখিয়েছেন তিনি। তাই বাহাদুর খাঁর শিক্ষকের তালিকায় অন্যপূর্ণার নামটি সবিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাহাদুর খান দুই সন্তানের জনক। তাঁর দুই পুত্র বিদ্যুৎ খাঁ এবং কিরিট খাঁ। এ দু'জনও ভারতীয় সঙ্গীতে সুবিখ্যাত নাম। তবে ছেট ছেলে কিরিট খাঁ ৫১ বছর বয়সে

মারা যান। বিদ্যুৎ খাঁর পভিত সুলভ সরোদ বাজনা এখন সারাভারতের সুস্থ সঙ্গীতের ধারাকে গতিময় করেছে।

বাহাদুর খাঁর অপর দুই ভাই ওস্তাদ আবেদ হোসেন খান এবং মোবারক হোসেন খান বাংলাদেশের সঙ্গীত জগতের সুবিখ্যাত দুই পুরুষ। আর ছোট ভাই শেখ সাদী খানের কথা তো শুরুতেই উল্লেখ করেছি। আবেদ হোসেন খান সরোদে এবং মোবারক হোসেন খান সেতারে বাংলাদেশের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করেছেন। মোবারক হোসেন খান বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর মহাপরিচালক ছিলেন দীর্ঘকাল। রেডিও বাংলাদেশের একজন কর্মকর্তা ছিলেন। অন্য কোন সময়ে সুলেখক সুবিখ্যাত সেতার বাদক এবং সুরঙ্গীর এই পুরুষকে নিয়ে বিস্তারিত লিখিবো। কারণ তিনি ছিলেন আমার প্রতিদিনকার স্বজন।

বাহাদুর খানের অনবদ্য সৃষ্টি রাগ বিভাস, রাগ দয়াবতী, রাগ রাগেশ্বী, রাগ নাত বিলাবল, এইচ এম ভি (ইন্ডিয়া), ই এম আই (লন্ডন) এবং আটলান্টিস মিউজিক থেকে বেরিয়েছে। তাঁর ছাত্র হিসেবে বাংলাদেশের ওস্তাদ শাহাদত হোসেন খান আজ সর্বজন প্রিয়। একুশে পদক প্রাণ্ড ভারতের খ্যাতিমান ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন কল্যাণ মুখাজ্জী, মনোজ সরকার এবং তেজেন্দ্র নারায়ণ মজুমদার।

আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় আলী আকবর কলেজ অব মিউজিকে তিনি শিক্ষক হিসাবে কাজ করেছেন অনেক দিন। ইতিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিক বিভাগের শিক্ষক হিসাবে তাঁর নাম অধিিতীয়।

সারাদিন আলাপ চারিতা শেষে সরোদ হাতে নিলেন সঙ্গীতের এই যাদুকর। বললেন, আমাকে আমার ওস্তাদরা যেমন শর্ত আরোপ করেছিলেন আমিও তেমনি আমার দুই পুত্রকে তালিম দেয়ার শুরুতেই অনুরূপ শর্ত দিয়ে তাদের সঙ্গীত জীবন শুরু করি। এবং তাদের ওয়াদা করিয়েছিলাম যে, কখনোই সস্তা জনপ্রিয়তার বসে মূল ঘরানা থেকে বিচৃত হতে পারবে না। আমাদের বংশ পরম্পরায় যে ঘরানা সারা ভারত বর্ষে আজ সম্পদ হিসেবে গৃহীত- সেই সম্পদের নিলাম করা যাবে না।

কথা শেষ করে বাহাদুর খাঁন তাঁর আঙুলের ঝঁকারে কাপিয়ে তুললেন সন্ধ্যার আবহ। দুঁচোখ বন্ধ করে শোনালেন বাংলাদেশের পল্লীসঙ্গীতের ধ্যন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, পছন্দের কোন রাগ আছে? বললাম রাগ দরবারী এবং রাগ শিবরঞ্জনী আমার খুব পছন্দ। হেসে বললেন- তাই হবে- এরপর কখন যে রাতের প্রথম প্রহর কেটে গেছে, টের পাইনি।



চ্যানিল বিজয়ী ব্রজেন দাস

৯.

ভুলে যাওয়া আর মুছে ফেলার কালচার আমাদের চিরস্তন। বিস্মৃতির জাতি হিসেবে আমাদের অবস্থান সম্ভবত সর্ব শীর্ষে। আর এই ভুলে যাওয়া কিংবা মুছে ফেলার পরিণামে অদ্ব্য হয়ে যাচ্ছে আমাদের ইতিহাসের বিরাট একটি অংশ। যা আমাদের সম্পদ কিংবা সম্পত্তি। আর এই পশ্চাংপদতার মূল কারণ রাজনৈতিক দর্শনের অপপ্রয়োগ। যেই দেশের জাতীয় কিংবা আন্তর্জাতিক মূলনীতি অপরিবর্তিত থাকবে না। সে দেশে এই অপপ্রয়োগ অপচেষ্টার থাবা দমন করা যাবে না। বৃটিশের আমাদের শাসন করেছে প্রায় দু'শ বছর। ভালো-মন্দ মিলিয়ে এই দীর্ঘ শাসনের অসংখ্য চিহ্ন থাকাটাই স্বাভাবিক। খুব কাছের শহর কলকাতা। সেখানে এখনো বৃটিশ শাসকদের নামে অসংখ্য সড়ক কিংবা প্রতিষ্ঠানের নাম অক্ষত রয়েছে। আর ভিট্টেরিয়া মেমোরিয়ানের কথাতে সবারই জান। দিল্লীতে রয়েছে জিন্নাহ এভিনিউ, নিয়াকত আলী খান এভিনিউ। জিন্নাহর বাড়ীটি ভারত সরকার স্বতন্ত্রে রেখে দিয়েছে অক্ষত অবস্থায়। কিন্তু আমাদের দেশে বৃটিশ কিংবা পাকিস্তান আমলের শাসকদের কোন চিহ্ন অবশিষ্ট নেই। শুধুমাত্র ১৯৬৪ সালে বাংলাদেশ টেলিভিশন ভবনের উদ্বোধনী প্লেটে আইটুব খানের নাম সবার অজান্তেই অক্ষত আছে। অবশিষ্ট ছিল ঢাকার বেইলি রোড। লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার স্টুয়ার্ট বেইলির নামে যে বেইলি রোড হয়, বর্তমানে তা পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে নাটক স্মরণী।

অর্থচ রামায়নের রাবণ এখনো স্বতন্ত্রে সংরক্ষিত। দাক্ষিণাত্যে রাবণের পূজোও হয়।

কারণ রাবণ চরিত্র সবার জানা দরকার। মুছে ফেললেতো আর চিহ্নিত করার সুযোগ থাকবে না। কিন্তু আমাদের দেশে ঘৃণিত কিংবা পরিত্যাজ্য কোন কিছুকে গুরুত্ব দেয়া হয় না। ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হয়ে যায় একটি ইতিহাস। ইউরোপে হিটলার কিংবা মুসোলিনীর সর্বশেষ ভাষণ দানের স্থানটিকে সুরক্ষিত করে রাখা হয়েছে পর্যটকদের জন্য।

দেখে এলাম ইতালীর রোমে মুসোলিনীর শেষ ঘোষণার স্থানটি ইতিহাসের মাইল ফলক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

একইভাবে আমাদের সংস্কৃতির ইতিহাসও সমানজনকভাবে সংরক্ষণ করা যাচ্ছে না। কোন না কোন ভাবে রাজনৈতিক বিবেচনায় পছন্দ অপছন্দের যাতাকলে আমাদের সংস্কৃতির ইতিহাস বারবার উপেক্ষিত হচ্ছে। রাজনৈতিক বিবেচনায় একজন সফল মানুষেরও সফল কৃতিত্ব স্বীকৃতি কিংবা সৃষ্টি মুহূর্তেই অস্থীকার করতে বিবেকে বাঁধেন।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধে আব্দুল জব্বার খান ছিলেন একজন অগ্রজ প্রতিম মানুষ। স্বাধীন বাংলা সরকারের তথ্য অধিদপ্তরের তিনি ছিলেন পরিচালক। ১৯৫৩ সালে অর্থাৎ ভাষা আন্দোলনের সময়ই সর্বক্ষেত্রে বাংলা ভাষা প্রচলনের প্রক্রিয়ায় জব্বার খান পাকিস্তানীদের বিরোধীতা থাকে স্বত্ত্বেও নির্মাণ করেছিলেন বাংলাদেশের প্রথম সরাক চলচ্চিত্র ‘মুখ ও মুখোশ’। ছবিটি মুক্তি পেয়েছিলো ১৯৫৬ সালের তা আগস্ট। যা শুধু ইতিহাসই নয়। একটি বিশাল সংগ্রামের ইতিহাস। যার ফলশ্রুতিতে আজকের চলচ্চিত্র শিল্প, এফডিসি, শত সহস্র সিনেমা হল, লক্ষ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান। কিন্তু চলচ্চিত্রের এই সেনাপতি, সোনালী পুরুষ আব্দুল জব্বার খান কোন সরকারী স্মান কিংবা স্বীকৃতি পান নি। মুক্তিযুদ্ধ থেকে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রবেশের পর কেড়ে নেয়া হয় তার তথ্য অধিদপ্তরের (ডিএফপি) পদটি। চলচ্চিত্রের যাত্রা শুরুর দিনটিকে স্মরণ সরকার কোন কর্মসূচী, বিবৃতি কিংবা চলচ্চিত্র দিবস হিসেবে স্বীকৃতির কথা আজ পর্যন্ত তাবেনি।

আমাদের আরো একজন অহংকারের সমান পুরুষ ব্রজেন দাস। চ্যানেল বিজয়ী ব্রজেন দাস। সারা বিশ্বকে যিনি অবাক করে দিয়ে গড়েছিলেন পৃথিবীর সেরা মানুষের ইতিহাস। ১৯৬১ সালের ২১ শে সেপ্টেম্বর বিবিসি টেলিভিশনে বারবার ভেসে উঠলো একজন বাঙালী যুবকের মুখ, ফলাও করে সারা বিশ্বকে জানিয়ে দেয়া হলো যে ৩০ বছর বয়সের এই তরুণ ইংলিশ চ্যানেল বিজয় করে পেছনের ইতিহাসকে ভঙ্গ করেছেন। একইদিনে চ্যানেল বিজয়ের দুটি বিশ্ব রেকর্ড এখন তার দখলে। একটি হলো পরপর ৬ বার ইংলিশ চ্যানেল বিজয় করলেন তিনি। অন্যটি হলো, বিশ্বের দ্রুততম সাতারু হাসান আবদেল রহিমের দখলে ছিল রেকর্ডটি। একযোগে বিবিসি, রয়টারসহ বিশ্বের সকল মিডিয়ার ব্যাপকভাবে বাঙালী রাজপুত্রের বিজয়ের

খবর ছড়িয়ে পড়লো। তৎকালীন ইষ্ট পাকিস্তানের গভর্নর লেঃ জেনারেল আজম খান তারবার্তার মাধ্যমে অভিনন্দন জানালেন ব্রজেন দাসকে। বৃটেনে নিযুক্ত তৎকালীন রাষ্ট্রদূত জেনারেল ইউসুফ অভিনন্দন বার্তা নিয়ে যান ব্রজেন দাসের কাছে। যাতে লেখা ছিলো “Pakistan is proud of him”।

ব্রজেন দাসের জন্ম বিক্রমপুরের কুচিয়া মোড়া থামে। যা আমার থামের বাড়ী থেকে পদযোগে ২০ মিনিটের পথ। বিক্রমপুরের সেকাল একাল নিয়ে কাজ করার সময় ব্রজেন দাসের সেই বাড়ীতে গিয়েছিলাম তথ্য নিতে। আর ব্রজেন দাসও বলেছিলেন, আমার এলাকার যে কোন খেলাধূলার অনুষ্ঠানে যদি আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়, আমি সানন্দে অংশ নেব। ১৯২৭ সালের ৯ ডিসেম্বর ব্রজেন দাসের জন্ম। শৈশব থেকেই সাঁতারু হিসেবে এলাকায় পরিচিত চান। পরবর্তীতে বুড়িগঙ্গা নদীকে বেছে নেন সাঁতারের ট্রেনিং এলাকা হিসেবে। ঢাকায় বাড়ী ফরাশগঞ্জে। বুড়িগঙ্গা পায়ে হেঁটে ৫ মিনিটের পথও নয়। ১৯৫৩ সালে প্রথম কৃতকার্য্যতা দেখান তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সাঁতার স্থিয়োগিতায়। ১৯৫৫ সালে হন পাকিস্তান চ্যাম্পিয়ন। উৎসাহ বেঢ়ে যায়। তাই পরিকল্পনা করেন অলিম্পিকে অংশ নেয়ার। গঠন করা হয় অলিম্পিক ক্ষোয়াড়। নেতৃত্ব পান ব্রজেন দাস। কিন্তু ১৯৫৬ সালের অলিম্পিকে আর যাওয়া হলো না বাহুর আঘাতজনিত কারণে। কিন্তু স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়নি।

কথা প্রসঙ্গে ব্রজেন দাস বলেন, ‘আমার স্বপ্ন ছিলো সাঁতারের ইতিহাসে একটি রেকর্ড সৃষ্টি করে নিজের নামকে অস্ত্রাণ রাখা। তবে তা যে বিশ্ব রেকর্ড হবে একথা ভাবিনি। ভেবেছিলাম দেশের ভেতরেই এমন এক রেকর্ড করবো যা অভঙ্গ থাকবে। তাই তিনি পরিকল্পনা নেন দূরপাল্লার সাঁতারে রেকর্ড করবেন। তাই হলো। নারায়ণগঞ্জ থেকে চাঁদপুর পর্যন্ত চলে গেলেন সাঁতার কেটে। দেশের ভেতর তৈরী হয়ে গেল দূরপাল্লার সাঁতারের রেকর্ড। নারায়ণগঞ্জ থেকে চাঁদপুর পর্যন্ত এই নদীপথের দূরত্ব ছিল ৪৬ মাইল। পরবর্তীতে ঢাকা সুইমিংপুলে সাঁতার কাটেন টানা ৪৮ ঘন্টা। এটাও একটি রেকর্ড। আত্মিক্ষাস দারণভাবে বেঢ়ে যায়। স্বপ্ন দেখেন ইংলিশ চ্যানেলে গিয়ে সাঁতার কাটার।

ব্রজেন দাস বলেন, সত্যি কথা বলতে কি, তৎকালীন পাকিস্তান সরকার আমাকে অনেক সাহায্য করেছে। চ্যানেল বিজয়ের আগে যেমন সহযোগিতা করেছে, তেমনি চ্যানেল বিজয়ের পরে সেই সরকারের কাছ থেকে পাওয়া সম্মান ছিলো অক্ষিম। এবং ‘pride of pakistan’ এওয়ার্ড দিয়ে আমাকে বলেছেন, তুমি আমাদের ছেলে, আমাদের অহংকার’। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও পাকিস্তান থেকে আমাকে বহুবার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। বলেছে তুমি এখনো আমাদের অহংকার। আমাদেরই ছেলে। করাচিতে গিয়ে একাধিকবার তাদের সাঁতারদের ট্রেনিং দিয়ে এসেছি।

১৯৫৮ সনে ব্রজেন দাস প্রথম চ্যানেল বিজয় করেন। একদিকে আইউব খানের



ব্রজেন দাসের সঙ্গে শরাফুল ইসলাম

মার্শাল ল, শিশু সংবিধানের অপম্ভু, অন্যদিকে চ্যানেল বিজয় করে বাঙালী পুত্রের অসাধারণ সাফল্য টর্চেডের মধ্যে, একবালক রোদ্বের মতো হাতছানি দেয় সারা দেশকে। আইটেব সরকার তার রাজনৈতিক বিবেচনাকে উপজীব্য না করে ১৯৫৯ সালে ব্রজেন দাসকে ‘pride of performance’ এ্যাওয়ার্ড দিয়ে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেন। এতে করে ব্রজেনের উৎসাহ দিগন্বন্ত হয়ে যায়। তিনি স্বপ্ন দেখেন বিশ্ব জয়ের। বিশ্ব রেকর্ড শিরোপা ছিনিয়ে নেন। একই সঙ্গে মিসরের আবদেল রহিমের গড়া বিশ্বরেকর্ড অতিক্রম করে হয়ে ওঠেন দ্রুততম সাঁতার। ১৯৬১ সালের ২১ শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা ৬ টায় ক্যাপ গ্রীস থেকে শুরু হয় বিশ্বরেকর্ড গড়ার সোপান। শেষ হয় রাত ৪ টা ৩৫ মিনিটে সেন্ট মার্গারেট সাগর অতিক্রমের মধ্য দিয়ে। অর্ধাং ফ্রাস থেকে ইংল্যান্ড। শুধু তাই নয়, এই দুটি বিশ্ব রেকর্ডের পাশাপাশি আরও একটি রেকর্ড রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। আর সেটি হলো ১২ দিনের মধ্যে তিনি দুইবার চ্যানেল অতিক্রম করেন। চূড়ান্ত পর্বে ব্রজেনের ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মোহাম্মদ আলী।

ব্রজেন দাস তার ম্যানেজারের কথা শুন্দার সঙ্গে স্মরণ করেন এবং বলেন, এই মানুষটির অবদান আমার সাফল্যের অন্যতম সহায়ক হিসেবে কাজ করেছে। ইংলিশ চ্যানেল সুইমিং ফেডারেশনের সেক্রেটারী মি. জে ইউ উড ব্রজেন দাসের পর্যবেক্ষক হিসেবে কাজ করেন। আর ব্রজেন দাসের গতিকে লক্ষ্য করে ফ্রাস থেকে ইংল্যান্ড পর্যন্ত যে বোট ছিলো সেটির ক্যাটেন ছিলেন Let Hutchi Son। আর বোটটির নাম ছিলো ভিক্টর (Victor)।

ব্রজেন দাসের কাছে সবচাইতে আনন্দজনক স্মৃতি হলো বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টির পর বৃটেনের রানী এলিজাবেথ তাঁর রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রণ জানিয়ে সম্মান জানান। এবং তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৮৬ সালে বৃটেনস্থ চ্যানেল সুইমিং এসোসিয়েশন থেকে ‘King of Channel’ এওয়ার্ড দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

১৯৫৮ সনে প্রথম চ্যানেল বিজয়ের আগে ব্রজেন দাস ইতালীর ক্যাথি আইল্যান্ড থেকে নেপোলী পর্যন্ত ম্যারাথন সাঁতার প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অর্জন করেন। এর পর থেকেই শুরু হয় চ্যানেল বিজয় পর্ব। ১৯৫৯ সালে ফ্রান্স থেকে ইংল্যান্ড, একই বছর ইংল্যান্ড থেকে ফ্রান্স একইভাবে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত ৬ বার চ্যানেল বিজয়ের পর অর্জন করেন ২টি বিশ্ব রেকর্ড। Guinness Book of World Records এ প্রথম বাংলা হিসেবে নাম লেখান। পেশাগত কারণে যতোবার ব্রজেন দাসের মুখোমুখি হয়েছি, কিংবা বিনা কারণেও যখন গল্প করা কিংবা চা পানের আহবানে তাঁর ফরাশগঞ্জের বাসায় গিয়েছি। ততবারই তিনি মনের মধ্যে একটা গভীর ক্ষেত্রের আভাস দিয়েছেন। ব্রজেন দাসকে ‘ব্রজেন দা’ বলে সমোধন করতাম। যার গড়া ইতিহাস আমাদের পাঠ্যপুস্তকে স্থান পেয়েছিলো- যাঁর ইতিহাস আমাদের গৌরবকে হিমালয় সমান র্যাদান দিয়েছে, স্বাধীনতার পর থেকে কোন সরকারই তার সঠিক খেঁজ রাখেননি। ১৯৯৯ সালে স্বাধীনতা পদক দিয়েই সব দেনা পাওনা মিটিয়ে দেয়া হয়েছে। রাষ্ট্রীয়ভাবে একুশে পদক দিয়েও তাকে সম্মান জানানো হলো না। একজন সর্বোচ্চ সম্মানিত বীরকে সর্বোচ্চ সম্মানের পুরস্কারটি দেয়া হলো না।

ব্রজেন দাসের মুখোমুখি হওয়ার প্রথম দিনে শিহরিত হয়েছিলাম। আমার সমীকরণে এমন একজন বিশ্বজয়ী মানুষকে কাছে পেয়ে আমার প্রাণ্পরি হিসাব রবিকরোজ্বল হয়েছে। যেমনটি হয়েছিলো মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন কিংবা আবদুল জব্বার খানকে পেয়ে।

ব্রজেন দাস হিমশীতল সমুদ্রের উভাল চেউয়ের শিহরণ জাগানো সাঁতার কাটার ঘটনা যে ভাবে বর্ণনা করেছেন তা একটি চলচিত্র তৈরীর অফুরন্ত ভান্ডার।

১৯৬৪ সালে ব্রজেন দাস জাপান এসেছিলেন। টোকিও অলিম্পিক'৬৪ তে ব্রজেন দাস আমেরিকান সুইমিং দলের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে টোকিওতে এসেছিলেন। আমরা যাকে সঠিক সম্মান দিতে পারিনি, তাঁকে সম্মান দিয়েছে বিদেশীরা। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট Lyndon Johnson ব্রজেন দাসকে তাদের সাঁতার দলের সঙ্গে পেয়ে সাক্ষাতও করেছিলেন।



মুফ্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলীর সঙ্গে ব্রজেন দাস

১০.

You are the king of Channel and I am the king of ring. But I think your achievement is ever greater than mine".

দ্বিতীয় সাফ গেমসে দেখার হবার সাথে সাথেই চ্যানেল বিজয়ী ব্রজেন দাসকে কথাগুলো বলেছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মুফ্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী।

ব্রজেন দাসের সঙ্গে আলাপকালে বলেন, ১৯৬১ সালে বৃটেনের রাণী এলিজাবেথও বলেছিলেন "You are the king of Channel" আর ১৯৮৬ সালে বৃটেনের চ্যানেল সুইমিং ফেডারেশন থেকে এওয়ার্ড দিয়ে তা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

ব্রজেন দাস বলেন, "আমার জীবনের এত বড় প্রাপ্তি বাংলাদেশকেই বার বার পরিচিত করেছে। কিন্তু আমার বিশ্ব রেকর্ডের এত কাল পরেও বাংলাদেশের কোন স্প্রোটসম্যান কোন নতুন রেকর্ড করতে পারলোনা, এটা ভাবলে হতাশ হই।"

ব্রজেন দাস বলেন, "আমেরিকান সরকার যখন ১৯৬৪ সালে অলিম্পিকে সাঁতারের দলকে উপদেশ বা নির্দেশনা দেয়ার জন্য আমাকে ডাকলেন, তখনও ভেবে ছিলাম সাঁতারে যদি অলিম্পিকে অংশ নিতে হয় তবে বাংলাদেশই নিতে পারে। সাফল্যের সম্ভাবনাও প্রচুর। কিন্তু আমাদের দেশে সেই চিন্তা-ভাবনা ছিলনা। অবেশেয়ে আমি আমেরিকার আটলান্টাতে যাই, ১৯৬৪ সালে টোকিও অলিম্পিকে অংশগ্রহণকারী আমেরিকান সাঁতার দলের উপদেষ্টা হিসেবে। সবচেয়ে বড় আনন্দের বিষয় হলো, তৎকালীন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট "Lyndon Johnson" তখন আমাকে তার সঙ্গে

সাক্ষাত করার সুযোগ দিয়েছেন।

১৯৫৮ সালে প্রথমবার চ্যানেল বিজয়ের স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, একদিকে রাতের অন্ধকার, অন্যদিকে সমুদ্রের গর্জন, সেই সঙ্গে হিম শীতল জলরাশি ভীত হয়ে ছিলাম। যদিও চ্যানেলে যাবার প্রাক্কালে আমি ক্যাপ্টি আইল্যান্ড থেকে নেপলী পর্যন্ত কৃতকার্যতার সঙ্গে সাঁতার কেটে পাড়ি দিয়েছিলাম। কিন্তু সমস্ত আত্মবিশ্বাসকে পুঁজি করেও ১৯৫৮ সালের ১৮ আগস্ট মধ্যরাতে যখন লোমহৰ্ষক ইংলিশ চ্যানেলে নামলাম, কোথায় যেন অজানা আতক আমাকে আচছান্ন করে ফেলে। কিন্তু যখন দেখলাম আমি তো একা নই। বিশের ২৩ টি দেশ থেকে সাঁতার এসেছেন। যদিও এশিয়া থেকে আমি একাই ছিলাম। অন্যান্য সাঁতারদের দেখে মনে হলো, বিশ্ব জয়ের স্বপ্নের কাছে শৎকা কখনো মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেন। শুরু হলো সাঁতার। “Billy Bultin channel Swimming” প্রতিযোগিতা। সত্যি কথা বলতে কি, যতই এগুচ্ছ শৎকা এবং বিজয় আমাকে ততই গ্রাস করছে। একে একে অনেক সাঁতারই মাঝাপথ থেকে বিদায় নিলেন। অন্যদিকে আমি ধীরে ধীরে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠলাম। যেহেতু সার্বিকভাবে পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা আছে। অতএব তায় পেয়ে কি হবে? মুহূর্তেই মনের মধ্যে উঁকি দিল একটি আলোকজ্ঞ সূর্য রেখা। বিশ্বস এবং আত্মবিশ্বাস এককার করে দিয়ে সাঁতারের কৌশলে একটি উদ্বীপনামূলক প্রেরণা জোগালাম। সত্যি কথা বলতে কি, মধ্যরাত গড়িয়ে কখন যে, সমুদ্রকোল থেকে উপরে উঠে গেছে সূর্য টেরই পাইনি। দুপুর গিয়ে অপরাহ্ন। ক্লান্ত সূর্য যখন আবার ফিরে আসছে সমুদ্র মাঝের কোলে, ঠিক তখনই আমি স্পর্শ করলাম ফ্রাসের উপকূলে ইংলিশ চ্যানেলের সীমানা। শুধু তাই নয়, অংশগ্রহণকারী ২৩টি দেশের সাঁতারদের মধ্যে আমি হলাম প্রথম।

ব্রজেন দাস বলেন, সাঁতারের এক পর্যায়ে আমার শরীর বরফ শীতল হয়ে এমন অবস্থা হলো যে, আমি বুঝতে পারছিলাম এই বুঝি মতুর আগ্রাসনে সমুদ্রের অতল গহবরে তলিয়ে যাবো। কিন্তু আমার অদূরে চলত পর্যবেক্ষণ বোটের শব্দ যে অচেতন থেকে সচেতন করে তোলে।

ব্রজেন দাসের সঙ্গে বাংলাদেশ ও ভারতসহ বিশের বিভিন্ন দেশের খ্যাতিমানদের সম্মতি ছিল। ব্রজেন দাসের স্ত্রী মধু ছিলেন একজন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী। বাংলাদেশ ও ভারতের খ্যাতিমান চলচ্চিত্র ব্যক্তিদের সঙ্গে ছিল দরবণ জানা-শোনা। ব্রজেন দাস বলেন, সাফল্য মানুষকে সবার অজান্তেই পরিচিতি এনে দেয়। তখন কোন অনুষ্ঠানাদিতে দেখা হলে, বিখ্যাত মানুষরাও কুশল বিনিময় করে থাকেন। তবে বাংলাদেশের বাইরে কোলকাতার মহানায়ক উত্তম কুমার, বিশ্বের অমিতাভ বচন, পদ্মিনী জওহর লাল নেহেরু সহ অনেকের সঙ্গেই বিশেষ সম্পর্ক হয়েছে।

১৯৮২ সালে নিউদিল্লীতে এশিয়ান গেমসে অমিতাভ বচনের সঙ্গে দেখা হয়। অমিতাভ তখন কাগজ কলম এগিয়ে দিয়ে বলেন, দাদা, জয়া আপনার কৃতিত্বের কথা আমাকে সব বলেছে। আপনার একটি অট্টোফাফ দিন। আমি তা আমার ছেলেমেয়েকে

দেখিয়ে বলবো, আপনার চ্যানেল বিজয়ের গৌরবের কথা।

মজলুম জননেতা, মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী বলেন, ব্রজেন তোমার প্রতি  
আমার দোয়া রাইল। আমরা পাকিস্তানী হলেও বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানীরা তোমাকে  
নিয়ে গৌরবান্বিত।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান বলেন, ব্রজেন তুমি অকল্পনীয় স্পন্দন বাস্তবায়ন করেছো।  
আমরা বাঙালীরা তোমাকে নিয়ে গবৰ্বোধ করি। তুমি আমাদের অহংকার।

তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেন, “Our heartiest  
congratulation to you for your wonderful laurels for Pakistan.”

তৎকালীন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান বলেন, “Cheers my  
boy, Your name is engraved in every Pakistani heart for your  
brilliant success in creating world records which will be  
remembered for many years to come.”

বৃটেনের রাণী এলিজাবেথ বলেন, “Splendid achievement, Heartiest  
congratulation for your brilliant success.”

পশ্চিত জওহর লাল নেহেরু বলেছিলেন, “Every individual irrespective of  
caste and creed is proud of you.”

ব্রজেন দাসের সঙ্গে যতবার দেখা হয়েছে ততবারই তিনি চায়ের সঙ্গে বাখর খানি  
দিতে বলতেন কাজের ছেনেটিকে। ফরাশ গঞ্জেরও সেই বাসায় তাঁর কৃতিত্বের ছবি  
শোভা পায় একতলা, দোতালার কঢ়গুলোতে।

উল্লেখ্য আমি যখন অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র, তখন আমাদের সাহিত্য প্রবেশ গ্রন্থে “চ্যানেল  
বিজয়ী ব্রজেন দাস” নামে একটি স্মৃতিকথামূলক লেখা পাঠ্য ছিল। এই সাহিত্য  
প্রবেশের সম্পাদনায় ছিলেন মুনীর চৌধুরী ও ইরাহীম খলিল। আর ব্রজেন দাসকে  
নিয়ে লেখাটি লিখে ছিলেন, আ.ন.ম. বজলুর রশীদ। ব্রজেন দাসের চ্যানেল বিজয়ের  
সময়ে তিনি লঙ্ঘনে ছিলেন। খুব সহজ সরল বাংলায় সেই চ্যানেল বিজয় দেখার স্মৃতি  
কাহিনী আমাকে দারকনভাবে আকৃষ্ট করেছিলো। তাই বেড়ে উঠার পাশাপাশি  
পাঠ্যপুস্তকে যাঁদের লেখা, যাঁদের নিয়ে লেখা- পড়েছি, তাঁদের সন্ধানে, তাঁদের সান্নিধ্য  
অর্জনের আকাংখায় ঘুরেছি এদিক ওদিক। এবং তাঁদের প্রায় সিংহভাগ লেখকের  
মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ আদায় করে নিয়েছি।

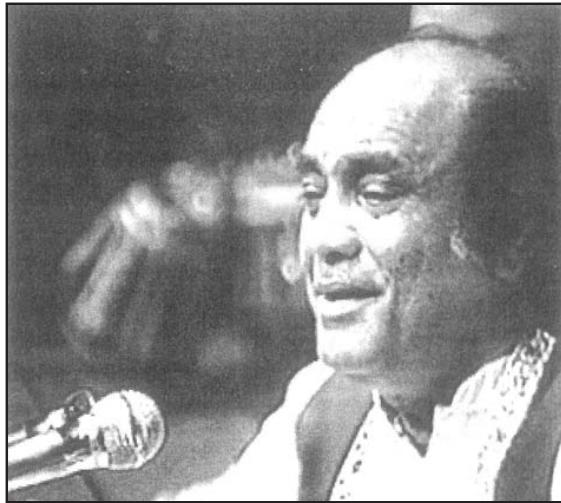
ব্রজেন দাসকে দেখে আমার মনে হয়েছিল, বাংলার সিংহ মানব অ্যতো অবহেলায়



চ্যানেল বিজয়ের পর ব্রজেন দাস

ইতিহাস থেকে মুছে যাচ্ছে। কারণ আমি যাঁর সম্পর্কে লেখা পড়ে আজ তাঁর মুখোয়াখি, সেই বিশ্ব ইতিহাস গড়া মানুষটি ফরাশগঞ্জের একটি ঘরে বসে দিন কাটাচ্ছেন।

একদিন বিদায়ের সময়ে ব্রজেন দাস বললেন, “শরাফুল আপনার কথা আমার মনে থাকবে। আপনি বার বার আমার বাসায় আসেন। আমি খুবই খুশী। এবং একটি সুন্দর সময় কাটাই। আপনার আগ্রহ আমাকে আরোও নতুন কিছু করতে আগ্রহ জাগায়। কিন্তু আমার যে, কিছু করার সুযোগ নেই। কারণ যার যেখানে থাকার কথা, সে সেখানে নেই।



গজল স্ট্রাট মেহেদী হাসান

### ১১.

১৯৪৭ সাল। চূড়ান্ত হয়ে গেল দেশ বিভাগের সিদ্ধান্ত। মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে পূর্ব বঙ্গ ও পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে গঠিত হলো পাকিস্তান। পূর্ব বাঙ্গলার নামকরণ করা হলো পূর্ব পাকিস্তান। আর হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে ভারত হয়ে গেল আলাদা রাষ্ট্র। ধর্ম ভিত্তিক, সম্প্রদায় ভিত্তিক নির্ণয়ের কারণে হিন্দুরা দলে দলে চলে যেতে লাগলেন ভারতে, আর ভারতের অসংখ্য মুসলমানরা পাড়ি জমালেন পশ্চিম পাকিস্তান আর পূর্ব পাকিস্তানে। যেমন বাংলাদেশ থেকে কোলকাতায় চলে গেলেন সত্যজিৎ রায়, সুচিত্রা সেন, দেবব্রত বিশ্বাসের মত খ্যাতিমান পরিবারের কর্তারা। তেমনি ভারত থেকেও পাকিস্তানমুঠী হয়ে উঠলেন মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিথিযশা ব্যক্তিগণ।

এ সময়ে ভারতের রাজস্থানের লুনা গ্রাম থেকে ধ্রুপদ সঙ্গীতের একটি পরিবার পাড়ি জমান পাকিস্তানে। যোল পুরুষের ভিটে মাটি ছেড়ে এমন একটি পরিবারের কর্তারা দারুণভাবে ভেঙে পড়েছিলেন যখন দরজা বঙ্গ করে পা ফেলেন অনিশ্চিত উদ্দেশ্যে। অবশেষে গিয়ে পৌঁছান পশ্চিম পাকিস্তানের করাচীতে। চাল নেই, চুলো নেই। পরিবার পরিজন নিয়ে দৈনন্দিন জীবন যাপনে নেমে আসে কঠিন অনিশ্চয়তা। রাজস্থানের প্রিতিহ্যবাহী খান পরিবারটিকে তছনছ করে দেয় দারিদ্রের কষাঘাত। সঙ্গে আসা পরিবারের ২০ বছরের এক যুবক এই দারিদ্রকে মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হন। সঙ্গীত সাধনাকে সামলে রেখে বেরিয়ে যান কাজের সন্ধানে। মান সম্মান নিয়ে আর কি হবে?

কেই বা জানবে যে এই পরিবারটি রাজস্থানের একটি খ্যাতিমান সঙ্গীত পরিবার। অবশ্যে যুবক খুঁজে পেলেন একটি কাজ। সাইকেলের দোকানে মেরামত আর ফুটফরমায়েশ শোনা। যুবক শুরু করলেন সাইকেল সারাবার কাজ। সারাদিন শেষে ফেরেন বাসায়। সামান্য বেতন, এত কুণ্ঠিত পরেও প্রতিদিন সকালে চালিয়ে যান কঠ রেওয়াজের সাধনা। এমনকি কাজের ফাঁকে ফাঁকেও হঠাতে করে বেরিয়ে আসে সুরেলা কঠের কারকাজ। কিছুদিনের মধ্যেই কর্ম্ম যুবক হিসাবে পরিচিতি এসে যায় আশেপাশের দোকানদারদের মাঝে। স্বভাবে ন্য, আচরণে বিনয়ী, কথা-বার্তায় লাজুক এই তরুণ কখনো কখনো উচ্চ কঠে গেয়ে উঠেন রাজস্থানী পল্লীগীতি। একদিন পর্যবেক্ষণ মটরওয়ার্কশপ থেকে প্রস্তাব আসে কাজের। গাড়ী মেরামতের। বেতন সামান্য বেশী। পরিবারের আর্থিক অবস্থা চিন্তা করে সাইকেল দোকানের মালিককে বলে যোগ দেন গাড়ী মেরামতের দোকানে। এক পর্যায়ে ডিজেল ট্রান্স্ট্র মেকানিক হিসাবে আশেপাশে ছড়িয়ে পরে তার নাম। একদিকে সঙ্গীত বিষয়ে পিতার শেখানো পর্বের উন্নতি দেখে অনুমতি মেলে রেডিওতে অডিশনের। চরম উৎসাহে অডিশনের জন্য আবেদন করেন ট্রাকটর মেকানিক। বিষয় ঠুমরি। ডাক আসে রেডিও থেকে। এবং তার ঠুমরি শুনে আনন্দে আপুত হয়ে যান বিচারকরা। মুহূর্তেই পাশ। সেই থেকে ঠুমরি গায়ক হিসাবে তালিকাভুক্তি এবং রেডিও পাকিস্তানে নিয়মিত অংশগ্রহণ।

এইভাবেই যাত্রা শুরু করেন উপমহাদেশের গজল সফ্রাট মেহেদী হাসান। তাঁর জন্য ১৯২৭ সালে ভারতের রাজস্থান প্রদেশের লুনা গ্রামে। দেশ বিভাগের সময় ভারত ছেড়ে চলে যান পাকিস্তানে। মেহেদী হাসানের পূর্বপুরুষ দীর্ঘদিনের সঙ্গীত ঘারানা হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলো রাজস্থানে। বিশেষ করে তাঁর বাবা ওস্তাদ আজিম খান এবং চাচা ওস্তাদ ইমামুল খান সারা রাজস্থানে ছিলেন সুপরিচিত।

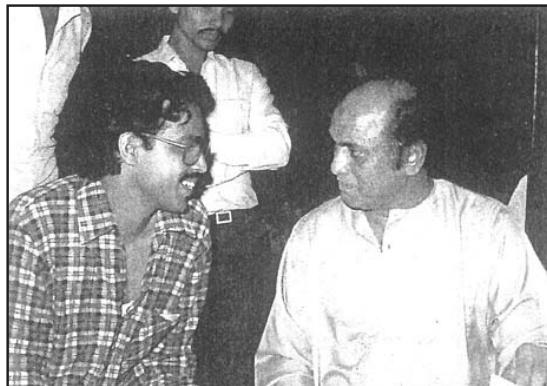
মেহেদী হাসানের মুখোমুখি হবার সুযোগ হয়েছে তিনবার। একবার জাতীয় প্রেসক্লাবে, দ্বিতীয়বার ঢাকার সুন্দর বন হোটেলে, তৃতীয়বার মুখোমুখি হই, মগবাজারস্থ শ্রুতি রেকর্ডিং স্টুডিওতে। সার্ক উপলক্ষ্যে ঢাকায় আসেন ১৯৮৫ সালে। যখন তিনি একটি বাংলা গজল গাওয়ার প্রস্তুতি নিয়ে এসেছিলেন। তখন আমার নিয়মিত যোগাযোগ ছিলো চলচিত্রকার খান আতাউর রহমানের সঙ্গে। ভূতপূর্ব সাঙ্গাহিক “সচিত্র স্বদেশে” ১৯৮৪ সালে চলচিত্র অ্যালবাম হিসাবে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের সময় খান আতাউর রহমানের সঙ্গে আমার নিয়মিত যোগাযোগ হয়। তিনিই ছিলেন আলবাম সংখ্যার প্রচ্ছদের মুখ। সঙ্গে ছিলো বিশেষ সাক্ষাতকার। অগ্রজপ্তীম সাংবাদিক আব্দুল হাই শিকদার এবং আমি আতা ভাইয়ের বিশেষ সাক্ষাতকারটি নিয়েছিলাম। এরপর থেকে আতা ভাইয়ের কাকরাইলহু প্রযোজনা সংস্থা অফিসে প্রায় আড়তা হতো আমাদের। এমনই এক আড়তায় আতা ভাই জানালেন যে, পরের দিন বিকেলে তার শ্রুতি রেকর্ডিং স্টুডিওতে মেহেদী হাসান আসবেন একটি বাংলা গজল রেকর্ড করার জন্য। এই তথ্য অনুযায়ী বিকেলে চলে গেলাম সোজা শ্রুতি রেকর্ডিং স্টুডিওতে। চুক্তেই দেখা হলো, নাজমুল হুসাইনের। তখন তিনি ছিলেন চলচিত্র বিজ্ঞাপনের বলিষ্ঠ কঠ। “হাঁ, ভাই আসিতেছে” হিসাবে নাজমুল হুসাইনের খ্যাতি ছিল প্রায় সকল রেডিও শ্রোতাদের কাছে। পরবর্তীতে অবশ্য মাজহারুল

ইসলাম দখলে নেন জায়গাটি। যাই হোক, ভেতরে চুক্তেই হেসে উঠলেন চাষী ভাই। পরিচালক চাষীনজরগল ইসলাম। রিহার্সেল রংমের একপাশে চেয়ারে আছেন গজল সন্তাট মেহেদী হাসান। পাশের চেয়ারে রংনা লায়লা। সালাম দিয়ে বললাম রেকর্ডিং এর ফাঁকে সময় পেলে একটি সাক্ষাতকার নিতে চাই। সাধারে রাজী হয়ে গেলেন। বললেন, রেকর্ডিং এর ফাঁকে ফাঁকে যতটুকু সময় পাবো, সবটুকুই আপনার জন্যে।

উল্লেখ্য, মেহেদী হাসান ইংরেজীতে খুব একটা বলেননা। আমি উর্দু বুবলেও উত্তরের রেশ ধরে কাউটার প্রশ্ন উন্দুতে করতে পারিনা। তাই রংনা লায়লা আমাকে দারণভাবে সহযোগিতা করেন প্রশ্নের বিষয়ে। আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

আলাপচারিতায় গজলের ইতিবৃত্ত জানতে চাইলে গজল সন্তাট বলেন, ভারত বর্ষে গজলের সূচনা হয় ১২শ শতাব্দীতে। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, পারস্যের কবি সাউদা, মীর তাকি, মীর জাউক পাসৌ ভাষায় গজলের ধারা প্রবর্তন করেন। আর মীর্জা গালিব গজলের পাইওনিয়ার হিসাবে খ্যাত। মেহেদী হাসান বলেন, গজলের সুগভীর বাণী, সাধনার সুমহান বার্তা, আধ্যাত্মিকাদের কৌশলসহ সার্বিকভাবে এর জনক হিসাবে অভিষিক্ত হয়ে আছেন কবি হ্যারত আমীর খসরু। তিনি সঙ্গীতের প্রপন্দ কলা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কারসহ খেয়াল ও বিভিন্ন ধারার প্রবর্তক।

মেহেদী হাসান আরোও বলেন পরবর্তীতে গজলকে সর্বজন প্রিয়তার জন্য ব্যাপকভাবে প্রোত্তা তৈরিতে ফাঁদের অবদান নতশিরে স্মীকার করতে হয়, তাঁরা হলেন ওত্তাদ বারাকাত আলী খান, মুক্তার বেগম এবং বেগম আকতা।



গজল সন্তাট মেহেদী হাসান এর সঙ্গে শরাফুল ইসলাম

মূলত কবিরাই গজল লিখেছেন। কোন সাধারণ গীতিকারকরা নন, এমন প্রশ্নে মেহেদী হাসান বলেন, গজলের বাণী সুগভীর, তৎপর্যপূর্ণ এবং উপমাশ্রিত। তাই সাধক কবিদের কবিতা দিয়েই গজলের যাত্রা শুরু। কারণ গজলের অন্তর্নিহিত বাণী ও বার্তা

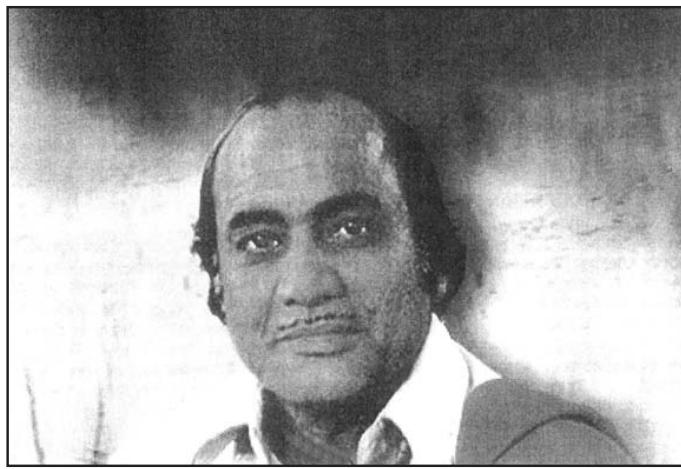
সাধারণ সঙ্গীতের মতো নয়। তাই সকল কবিও গজল বা শের লিখতে পারেন না। এর ধারা সম্পূর্ণ আলাদা। তবে ইদানিং অনেকেই গজল লিখছেন। কিন্তু ভাবধারা বদলে যাচ্ছে।

একজন গাড়ীর মেকানিক থেকে রেডিওতে সুযোগ এবং আজকের মেহেদী হাসান হওয়ার পেছনে তিনি ১৯৫২ সালে তৎকালীন পাকিস্তান রেডিওর কর্মকর্তা জেড বুখারী এবং রফি আনওয়ারের নাম শুন্দা চিত্তে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, আমি ঠুমরিতে অভিশন দেই। উনারা শুনে এত খুশী হন যে, আমার বুবাতে অসুবিধা হয়না যে, আমি পাশ করে গিয়েছি। শুরু হয় আমার ঠুমরির গাওয়া। রাগ খামাজ, পিলু দেশ, তিলক কামোদ, বাদী-সমবাদী আমার কঠে শুনে তাদের পাশাপাশি সঙ্গীত মহলেও প্রশংসিত হয়।

মেহেদী হাসান বলেন, ধীরে ধীরে আমি আমার জানা রাগগুলোকে সংমিশ্রণ করে রেডিওতে দু'একটা গজল গাওয়ার চেষ্টা করি। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানী যে, আমার গায়কী কিভাবে যেন সবার মনকে স্পর্শ করে। প্রশংসিত হয়, তখন বুখারী সাহেব এবং আনওয়ার সাহেব আমাকে রেডিওতে গজলের পার্টটাইমার শিল্পী হিসাবে বিশেষ সুযোগ দেন। এভাবেই আমি গজল শিল্পী হয়ে উঠি।

মেহেদী হাসান ১৯৫২ সাল বলতেই, আমার মনে পরে যায়, ভাষা আন্দোলনের কথা। জানতে চাই, ১৯৫২ সালের বাংলা ভাষার জন্য যে আন্দোলন হয়েছে তা আপনি কিভাবে দেখেন?

উত্তরে মেহেদী হাসান বলেন, এটা খুব দুঃখজনক বিষয়। এটা আমাদের তৎকালীন শাসকদের একরোখামী। তা না হলে, মাত্ত্বাষা নিয়ে আন্দোলন হবে, গুলিতে শহীদ হবে, বিশ্বে এমন নজির নেই। যারা শহীদ হয়েছেন তারা মহান। শাসকদের অহংকারেই আজ আমরা বিচ্ছিন্ন। জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করলে যা হয়, আমাদের বেলায় তাই হয়েছে। তাই শাসক নয়, প্রয়োজন দেশ পরিচালকের। ক্ষমতায় যাওয়া নয়। দেশের দায়িত্ব গ্রহণ করলে অহংকার আসবে না। তা না হলে মাত্ত্বাষা নিয়ে আন্দোলন হবে কেন? এটা তো মৌলিক অধিকার। তা ছাড়া কোন কিছুই যে জোর করে চাপিয়ে দেয়া যায়না এবং চাপাতে গেলে তার ফলাফল যে শুভ হয় না- এটাই তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। মেহেদী হাসান বলেন, আজও আমি এখানে এসেছি একটি বাংলা গান গাওয়ার জন্য। আগেও গেয়েছি। সুতরাং বাংলা ভাষা আমিও ভালোবাসি।



মেহেদী হাসান

১২.

একাত্তরোত্তর কাল। সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ। স্বাধীনতার বান ডেকে যাচ্ছে ভরা পূর্ণিমার ইশারাণ্ডি জোয়ার ভাট্টার মতো। পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংক্ষরণ- চারিদিকে ব্যাপক উদ্যমতা।

১৯৫২ সনেও মহান ভাষা আন্দোলনে সাফল্য প্রাপ্তির পর একই উৎসাহ ও উদ্দীপনার ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছিলো সারা দেশে। বিশেষ করে বাংলা ভাষার ব্যাপক চর্চা প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সে সময়কার সংস্কৃতি কর্মীরা। মাত্র এক বছরের মাথায় বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) পূর্ণাঙ্গ সবাক চলচিত্র নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন কমলাপুর ড্রামা সার্কেলের পরিচালক নাট্যকর্মী আবুল জব্বার খান। ঢাকার গুলিস্তান সিনেমা হলের সে সময়ের মালিক এফ দোসানী চৰম বিরোধীতা এবং সভায় চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। জব্বার খান পাট্টা চ্যালেঞ্জ দিয়ে শেষ পর্যন্ত নির্মাণ করেন এদেশের ইতিহাসের প্রথম সবাক চলচিত্র ‘মুখ ও মুখোশ’। অর্থাৎ ভাষা আন্দোলনের অতি সাফল্যজনক অর্জন আমাদের চলচিত্র শিল্প।

কিন্তু ১৯৭১ সনে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর অনুরূপ উৎসাহ উদ্দীপনার ছোয়া সর্বক্ষেত্রে লাগলেও সঙ্গীতাঙ্গনে নেমে আসে অস্থিরতা। তাই বাংলাদেশের সঙ্গীতের মূলধারাকে উজ্জীবিত করতে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে কনসার্ট করতে এলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে ললিতা ধর চৌধুরী পর্যন্ত।

নদীর স্রোতে খড়কুটা আবর্জনা ভেসে আসবেই। আবার তা ভেসেই যাবে। কিন্তু পলি ভেসে যায় না। জমে জমে জেগে ওঠে পলিমাটির দীপ। এটাই নিয়ম। কিন্তু খড়কুটা আর আবর্জনা পানিকে সাময়িকভাবে নোংরা করে দেয়। আর এই আবর্জনার নোংরা পানি তার জোয়ার “সয়লাব” করে দিলো কোলকাতাসহ সারা ভারতের সঙ্গীতাঙ্গকে। জলচ্ছাসের মতো সয়লাব করে দিয়ে যায় আমাদের হাজার বছরের সঙ্গীতের ধারাকে। আমরা সবাই বিচলিত। এত সমৃদ্ধ এদেশের সঙ্গীত জগত যে ডুবে গেল ঘোর অঙ্ককারে। আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। সরকারও গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করলো বিষয়টি। অবশেষে সিদ্ধান্ত হলো, পাকিস্তানের প্রথ্যাত গজল শিল্পী মেহেদী হাসানকে এনে একাধিক কনসার্ট করা হবে। তাই হলো। আমাদের আহ্বানে সাড়া দিলেন মেহেদী হাসান। গজল সম্মান এলেন। বিশাল বিশাল কনসার্ট করলেন। লোকে লোকারণ্য। সবাই যেন সম্মত ফিরে পেলো। জেগে উঠলো। সবাই বর্জন করতে লাগলো পরগাছাগুলোকে। আমাদের সঙ্গীত ফিরে পেলো হারানো ‘ঐতিহ্য’।- কথাগুলো বলছিলেন ভারতের প্রথ্যাত গণসঙ্গীতশিল্পী ভূপেন হাজারিকা। ১৯৮৫ সালে ভূপেন হাজারিকার সাক্ষাৎকার গ্রহণকালে তিনি বলেন- ‘মেহেদী হাসান আমাদের সঙ্গীতের পুরোহিত’।

চাকার শৃঙ্খলি রেকর্ডিং স্টুডিওতে সাক্ষাৎকালে মেহেদী হাসান বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। তিনি বলেন, একজন প্রকৃত কর্তৃশিল্পীর জন্য পাসপোর্টটাই একটা বাঁধা। পাসপোর্ট আমাদের সীমানা তৈরী করে দেয়। ফলে আমরাই জন্মস্থান রাজস্থানে যেতে আমাকে ভিসা নিতে হয়। আমরা শিল্পী মানুষ। যখন খুশী চলে যাবো কনসার্ট করতে। কি পাকিস্তান, কি ভারত, কি বাংলাদেশ। অন্তত এই দেশগুলোতে আমাদের ভিসা উন্মুক্ত করে দেওয়া দরকার। তাহলে আর যখন খুশী, যেখানে খুশী কনসার্ট করতে চলে যেতে সমস্যা থাকবে না।

বাংলাদেশ সফরে আসা শিল্পীদের মধ্যে ভূপেন হাজারিকা ছাড়াও আরো অনেকের প্রিয় শিল্পীর তালিকায় এক নম্বরে উঠে এসেছে মেহেদী হাসানের নাম। পাকিস্তানের অনবদ্য গজল শিল্পী গোলাম আলীর সাক্ষাৎকার নিয়েছি একাধিকবার। তিনি বলেছিলেন, ‘মেহেদী হাসান আমাদের গজলের মহান গুরু। তাঁর কোন গজলের কনসার্ট থাকলে আমি চলে যাই গজল শুনতে’। পংকজ উদাস বলেছিলেন, ‘পাকিস্তানের মেহেদী হাসানের একজন যাদুকরী গজলের ওস্তাদ’। পভিত্র রবিশংকর বলেন, ‘মেহেদী হাসানের মাপকাঠি সাগরের মতো গভীর, আকাশের মতো বিশাল’। পাকিস্তানের খ্যাতিমান গজল শিল্পী ফরিদা খানম বাংলাদেশ সফরকালে শিল্পকলা একাডেমীর গীনরূমে বসে বলেছিলেন, ‘মেহেদী হাসানের জন্যেই আজ গজলের জগতিয়তা এ পর্যায়ে এসেছে’।

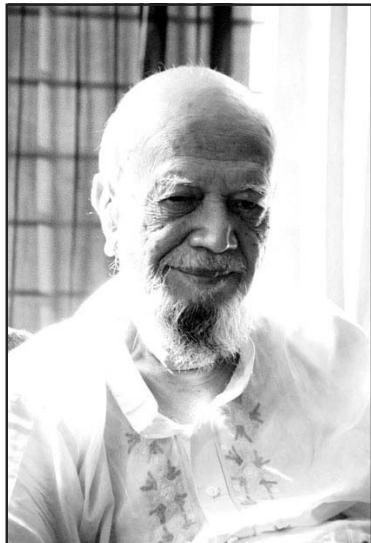
অন্যদিকে শৃঙ্খলি রেকর্ডিং স্টুডিওতে মেহেদী হাসান বলেন, বাংলাদেশের কর্তৃশিল্পী ‘রূপা লায়লা খোদার শ্রেষ্ঠ দান’। অনেক কথার ফাঁকে ডাক এলো রেকর্ডিংয়ের ডাক। মেহেদী হাসান চুকলেন রেকর্ডিং রুমে। আমি বসে আছি প্যানেল কক্ষে। তিনি গাইলেন,

‘তুমি যে আমার ভালোবাস।

তুমি যে আমার চোখের ত্বকঃ  
ওগো তোমায় না দেখলে  
মেটে না কোন আশা ..... ।'

বাংলা গজলে মেহেদী হাসানের শুন্দি উচ্চারণের বিষয়টি লক্ষ্য করার মতো। আবদুল  
মালিকের সুরে এই বাংলা গজলটি একটি বাংলা সিনেমার জন্য রেকর্ড করা হচ্ছিল।  
কিন্তু এই সন্ধ্যা লগনে খবর এলো, সার্ক অনুষ্ঠানের সময় হয়ে গেছে। অতএব এখনই  
যেতে হবে গজল পরিবেশন করতে। মেহেদী হাসান চলে গেলেন সার্কে গাওয়ার  
জন্য। রেখে গেলেন বাংলা গজলের স্থায়ীসহ একটি মাত্র অন্তরার জন্য তার কষ্টটুকু।  
বাকিটুকু রয়ে গেল অসমাঞ্ছ।

---



কবি আল মাহমুদ

১৩.

হঠাৎ ট্রেনের কামরায় চুকে পড়লো ৫/৬ জন যুবক। চাদর জড়ানো দেই। মুহূর্তেই  
শরীর থেকে খসে পড়ে গেল চাদর। অন্দর মহল থেকে বেরিয়ে এলো রাইফেল আর  
ষ্টেনগানের নল। সবগুলো অস্ত্রের মুখ তাক করা হলো। কামরায় বসে থাকা যাত্রীর  
বুকের দিকে। যুবকদের মধ্য থেকে একজন বললো চিক্কার করে কোন লাভ নেই।  
সঙ্গে যা আছে দিয়ে দিন।

যাত্রী বললেন, তোমরা কারা? এতগুলো অস্ত্রের মুখে নির্বিকার যাত্রীর এমন সাহসী প্রশং  
শনে হয়তো বা মুহূর্তেই মনের ভেতরে হোঁচট খায় অস্ত্রধারীরা।

আমাদের চেনার দরকার নেই। আজই আপনার জীবনের শেষ দিন। আগে সঙ্গে যায়  
আছে বের করুন। তোমাদেরকে দেবার মতো আমার কাছে তেমন কিছুই নেই।  
তোমরা কি চাও। যাত্রীর উত্তর।

অস্ত্রধারীদের ইতস্ততা দেখে যাত্রী বুঝতে পারলেন যে এরা পেশাগত ডাকাত নয়।  
উদ্দেশ্য রাজনৈতিক। তাই তিনি বিভিন্ন কৌশলে ওদের সঙ্গে সম্মাহনী ভাষা আর  
আচরণে কিছু মহৎ বাক্য উচ্চারণ করলেন। দেখলেন, বস্তুকধারীদের কঢ়  
অবরোহনের দিকে। কথা বলতে বলতে ব্যাগ থেকে পারফিউম বের করে বললেন—  
তোমাদেরকে উপহার দেওয়ার মতো এই পারইফিউম ছাড়া আমার কাছে আর কিছুই  
নেই।

ঐন্দ্রজালিক ভাবে সম্মোহিত হয়ে গেল অন্তর্ধারী যুবকরা। তাদের মধ্যে থেকে একজন হাত বাড়িয়ে পারফিউমটি নিয়ে বললো, সাবধানে যাবেন। সাবধানে লিখবেন। আজ আপনি বেঁচে গেলেন।

আবার গায়ে চাদর জড়িয়ে কমরা থেকে বেরিয়ে গেলো যুবকরা। এভাবেই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে এসছিলেন কবি আল মাহমুদ। আর এই ঘটনাকেই উপজীব্য করে তিনি লিখেছিলেন অসাধারণ গল্প ‘সৌরভের কাজে পরাজিত’।

সমকালীন বাংলা সাহিত্যের অন্যতম কবি প্রধান কবি আল মাহমুদ। পাশাপাশি গদ্য সাহিত্যে তাঁর অসাধারণ প্রতিভা বর্তমান কালের গদ্য লেখকদেরকেও ইর্ষান্বিত করেছে। প্রায় ৭৫ বয়সের বর্ষিয়ান এই পুরোধা কবিকে ১৯৭৮ সালে থেকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। সেই থেকে দীর্ঘদিন প্রায় নিয়মিত দেখা, কথা অনেকটা আড়তের আদলে সময় কাটানো ছিল আমার সেই কারণ্য প্রাপ্তির নিশানা। সাহিত্য প্রেমে হাবড়ুর খাওয়া। পত্রিকা অফিস চমে বেড়ানো। কাবিদের সান্নিধ্যে অর্জন কবিতার আসর, আলোচনা, সমালোচনা সব মিলিয়ে কবি কিংবা লেখক হওয়ার চেতনায় আকর্ষ ডুবে যাওয়া নাবিক হতে চেয়েছিলাম।

কবি আল মাহমুদ একজন অতি প্রাঞ্জল ব্যক্তি। যিনি আমাদেরকে খুব সহজেই সেই সৌরভের কাছে পরাজিত যুবকদের মতো সম্মোহিত করেছিলেন। এত বড় মাপের কবিকে কখনোই দেখিনি সামান্যতম অহংকারের সীমারেখা স্পর্শ করতে। এককথায় বলা যেতে পারে, তিনি একজন প্রবীণ বন্ধু হিসেবে আমাদের চাহিদা মতো সময় ব্যায় করেছেন। কখনো মগবাজারের নয়াটোলার সেই খেজুর গাছের তলায়, কখনো বা এই গাছ সংলগ্ন বাসায় কখনো বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতে।

কবি আল মাহমুদ গল্পের ছলে তাঁর লেখার অনেক পটভূমি সম্পর্কে বলতেন। বলতেন মনোজগতের দৃষ্টিতে অনুসন্ধানের কথা। বরাবরই তাঁর মুখ থেকে যেই যাতনার কথা আমি শুনেছি সেটা হচ্ছে দেশ প্রেম। তিনি ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সরাসরি অংশ গ্রহণ করেছিলেন। একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে রনাঙ্গনের যুদ্ধের মতোই তিনি সার্বক্ষণিকভাবে অনুভব আতঙ্ক করেন মাত্তুমিকে, তাই আরও একবার বঙ্গভবন থেকে বেরিয়ে আসার পথেও ক'জন যুবক চাদর খুলে অন্ত প্রদর্শন করেছিলো কবিকে। সেই ঘটনা অন্য সময় প্রত্যন্ত করার আশা রাখি।

যুক্তিযোদ্ধা কবির ভাবনা এরকম ‘মূলত সরকার বিরোধী মনোভাব আমাদের সহজাত প্রবন্তি। কারণ, সদ্য স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে আমাদের আশা আকাংখা যেমন সর্বমুখী, তেমনি রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রেও নতুন দায়িত্ব প্রাপ্ত সরকারের সীমাবদ্ধতা বহুযুক্তি। আর সেই দু'য়ের সমন্বয়হীনতার কারণে সংবাদপত্রের পাতায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যর্থতা কিংবা নাগরিক জীবনের দুঃখ দুর্দশা ফলাও করে প্রকাশিত হতে থাকে।

যেহেতু আমাদের দৈর্ঘ্য ক্ষমতা সীমিত, তাই সরকার পক্ষও সব সমালোচনা কিংবা ব্যর্থতা স্বীকার না করে ক্ষমতার প্রায়োগিক কৌশল অনেকটা দমননীতি গ্রহণ করে।

আল মাহমুদ স্বাধীনতার পর দৈনিক গণকর্ত্ত নামে একটি পত্রিকার সম্পাদক হন। সরকার বিরোধী অবস্থানের কারণে পত্রিকাটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। মূলত জাসদ সমর্থিত পত্রিকা গণকর্ত্ত সরকারের যাতীয় ব্যর্থতাকে ফলাও করে প্রকাশ করে। বিশেষ করে সরকারের সঙ্গে স্বাধীনতার যুদ্ধে সার্বিকভাবে সহযোগিতাকারী দেশ ভারতের স্বাধীনতা উত্তরকালীন আচরণ। গণকর্ত্ত সহজভাবে নিতে পারেন। যেহেতু তৎকালীন জাসদ নেতা মুক্তিযোদ্ধার একজন সেন্টার কমান্ডার মেজর জিল স্বাধীন দেশের ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্যদের কর্মকাণ্ড প্রতিবাদ করেন এবং বন্দী হন। তাই গণকর্ত্ত ভারত বিরোধী প্রচারে সোচার হয়ে ওঠে। একই সঙ্গে জাসদের গণবাহিনী দমনে সরকারী দমননীতিও সহজভাবে নিতে পারেন পত্রিকাটি। ব্যাপক যুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় স্বদেশ প্রেমের সংজ্ঞা। যা সেই সময় ব্যাপক সমর্থনও পায়। কবি আল মাহমুদ এই পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে সরকার কর্তৃক জেল বন্দী হন। এবং মুক্তি পান ১৯৭৫ সালে। একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বদেশ সমাজ এবং স্বাধীন দেশের পরিচালকদের কাছে তাঁর প্রত্যাশা ছিল স্বচ্ছ- পরিচ্ছন্ন সমন্বয় এবং সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা।



কবি আল মাহমুদের সঙ্গে শরাফুল ইসলাম

একবার কথা প্রসঙ্গে কবি আল মাহমুদ বলেন, আমি জানি এবং বুঝি যে, একটি নতুন দেশ পরিচালনা করা সুকর্তন কাজ। তাই রাতারাতি দেশের সমস্ত মানুষ সুখী হয়ে যাবে, সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নতি ঘটে যাবে তা সম্ভব নয়। একটা নতুন দেশকে সার্বিকভাবে গড়ে তুলতে হলে সুন্দর সুশ্রূত সমন্বয় এবং পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলো প্রাথমিক কাজ। কিন্তু আমার কাছে তখন মনে হয়েছে যে, আমরা অর্থাৎ আমাদের নেতৃত্বে অনেক কেশী এলোমেলো। সমন্বয়হীনতা এবং শৃংখলার ব্যাপক অভাব আমাকে মানসিকভাবে পীড়ন দেয়। যে কারণে মুক্তিযোদ্ধা করেছিলাম, তা সম্ভবত

অমূলক হয়ে যাচ্ছে মনে করে একজন লেখক হিসাবে তাড়না অনুভব করি।

উল্লেখ্য কবি আল মাহমুদ ১৯৩৬ সালে ব্রাক্ষণবাড়ীয়ার কসবা থামে জন্ম গ্রহণ করেন। যখন তিনি ঢাকায় আসেন তখন তিনি ২১ বছরের টগবগে তরুণ। তাঁর সৃজনশীলতার প্রারম্ভ ১৯৫৪ সালে। ঢাকা ও কোলকাতার পত্রিকায় একযোগে প্রকাশিত হতে থাকে কাব্য জগতের সুচারু পুরুষ আল মাহমুদের কবিতা। খুব অল্প সময়েই সাড়া ফেলে দেয় সাহিত্য জগতের এই নবাগত যুবক। কোলকাতা কেন্দ্রিক বৃন্দজীবি মহল আমলে নেয় কবিতার এই রাজপুত্রকে। বুদ্ধদেব বসু তাঁর সম্পাদিত কবিতা নামক বিখ্যাত সংকলনে বিখ্যাত লেখকদের সঙ্গে যুক্ত করেন আল মাহমুদের নাম। শুধু তাই নয়, বুদ্ধদেব বসু তাঁর সম্পাদকীয়তে আল মাহমুদকে একজন জায়েট কবি হিসেবে তখনই স্থীরূপ দেন। এরপর থেকে আল মাহমুদ আর ডান বাম দেখেননি। লেখার মানদণ্ডের বিবেচনায় যেকোন বোন্দো লেখকের খুব সহজেই প্রতাশালী এই কবিকে বিবেচনায় নেন। সিকান্দার আবু জাফরের সমকাল মানে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ লেখকদের বিচরণ ক্ষেত্র। মেধার বিকিরণে সমকাল আর আল মাহমুদ যুগল শব্দে পরিগত হন।

কবি শামসুর রাহমান এবং আল মাহমুদ দু'জনেই ছিলেন আমাদের কাছে গুরু প্রতীম। কিন্তু তাঁদের দু'জনের সম্পর্ক নিয়েও নানা কথা প্রচলিত ছিল কিংবা আছে।

এ প্রসঙ্গে কবি আল মাহমুদ বলেন কবি শামসুর রহমান একজন বড় কবি। অন্যতম প্রধান কবি। জিয়াউর রহমান জাতীয়তাবাদী দল গঠন করার সময় ‘ঘোষণা’ নামে যে চমৎকার একটি প্রকাশনা করেছিলেন তাঁর সম্পাদক ছিলাম আমি। এবং সেই সংকলনে কবি শামসুর রহমানের স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়ে লেখা কবিতা তোমাকে পাওয়ার জন্যে হে স্বাধীনতা সহ দুটি কবিতা আমি নিজে তাঁর কাছ থেকে নিয়ে সংযুক্ত করি। আমাদের মনন জগতের কথা কি সবাই জানে? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কাজী নজরুল্লের সম্পর্ক নিয়েও মুখরোচক ভিত্তিহীন অনেক কথা প্রায় প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তাঁদেরকে যারা স্টাডি করেছেন তাঁদের সম্পর্কে সম্মত জ্ঞান রাখেন যারা একমাত্র তারাই জানেন দু'জনের সম্পর্কের মূল গতি প্রকৃতি। তাছাড়া আমাদের সহজাত প্রবৃত্তিই হলো সৃজনশীল কাজে মধ্য মানুষরা যখন খ্যাতির শিখরে যাবে তখন প্যারালাল খ্যাতিমান মানুষটিকে প্রতিদ্বন্দ্বী করে তোলা। সৃজনশীলতা প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে হয়না, মহানসৃষ্টি কালজয়ী কাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে হয় না।

তবে কবি আল মাহমুদ সৃজনশীল লেখা সম্পর্কে বলেন, আমি কখনো ফরমায়েশী লেখা লিখিনা। লিখতে পারি না লিখা হয় না। ফরমায়েশী লেখা ভাল হতে পারে তবে যুগোন্তীর্ণ হবে কিনা সন্দেহ।